পুনতত্ত্ব

Volume 1.
June 1994

PRATNATATTA

Journal of Archaeology Department

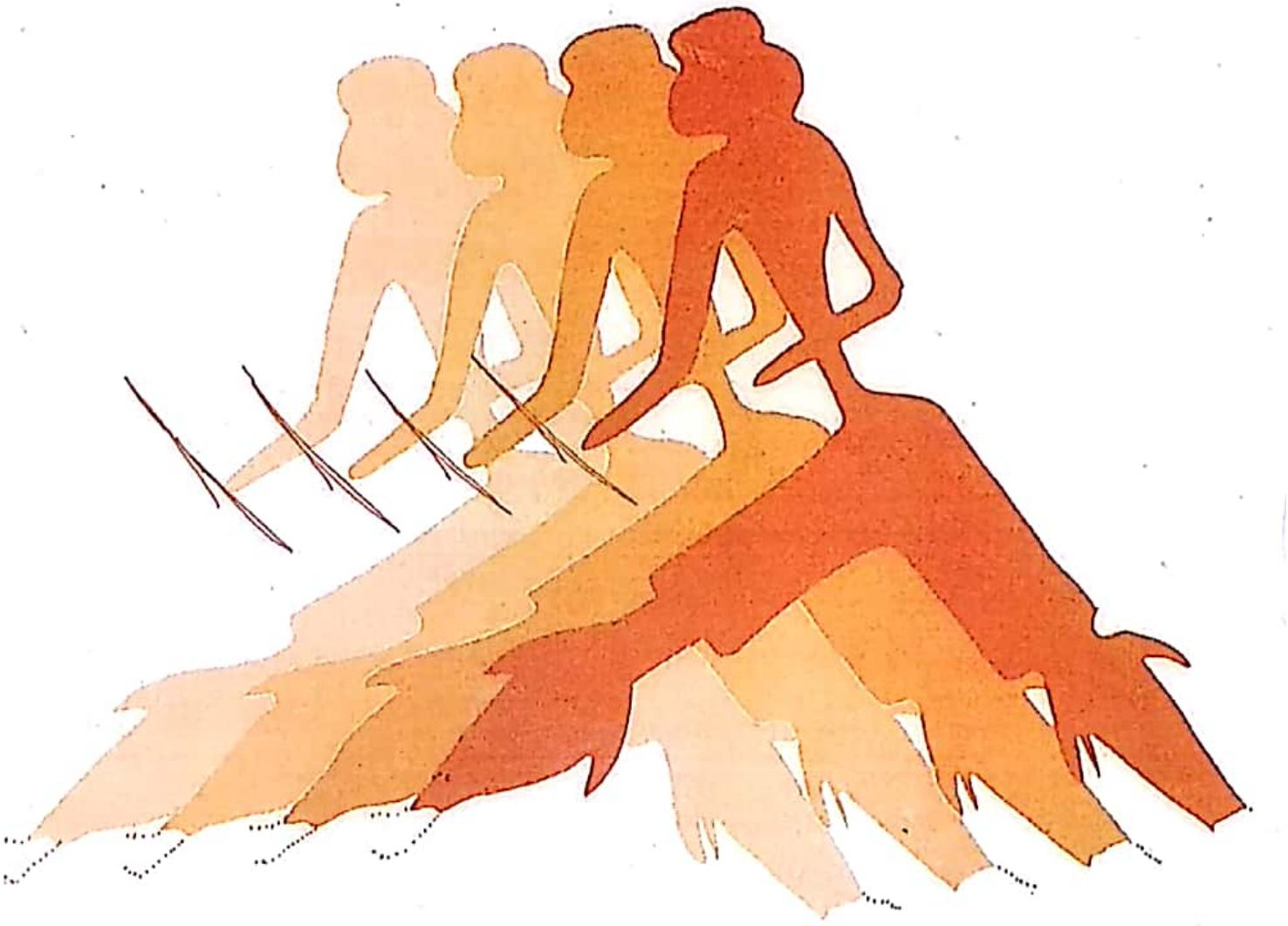

JAHANGIRNAGAR UNIVERSITY

সংযোজন সংখ্যা 1768
প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, জাবি

প্রত্নতত্ত্ব

PRATNATATTA

Journal of Archaeology Department

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ
সাভার, ঢাকা

Jahangirnagar University
Savar Dhaka Bangladesh

সেমিনার লাইব্রেরী
প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

প্রত্নতত্ত্ব

PRATNATATTA

Volume 1
June 1994

Editorial Board
Dr. A. K. M. Shahnawaz
Dr. Syed Kamrul Ahsan
Dr. M. Mozammel Hoque
Dr. Mostafizur Rahman Khan
Shah Sufi Mostafizur Rahman
Ahsit Baran Paul

Executive Editor
Dr. A. K. M. Shahnawaz

প্রত্নতত্ত্ব

PRATNATATTA

Annual Journal
Archaeology Department
Savar Dhaka
Bangladesh
Jahangirnagar University
Volume 1 June 1994

Cover Design : Dr. A. K. M. Shahnawaz

Cover Sketch : Mesolithic Painting From Terual, In Spain, This Hunter clad in trousers suggests That The Skins of Captured Prey were put to good use. Thread ueas Probably made from horsehair or animal tendons.

Printers : Shilpatoroo Prakashani
291, Sanagone Road
Dhaka-1205

প্রত্নতত্ত্ব

PRATNATATTA

Volume-1
June 1994

Bangladesh has a very rich and glorious past. But it is a matter of great regret that currently we don't have much opportunity for research into our origin and heritage with a truly scientific approach. In fact, we are deeply concerned about the scarcity of archaeological study and of the facilities needed for that in Bangladesh. only the other day there were little institutional support or back-up for archaeological studies and researches. The Jahangirnagar University authorities came forward to bridge the gap, and with the assistance of The Ford Foundation made an attempt to introduce a higher study programme in archaeology.

It was 1984 and the study of archaeology in Bangladesh got a new impetus with the Department of History, Jahangirnagar University offering a one-year MA Course in archaeology under the 'University Archaeology Project'.

From 1986 to 1991 a good number of students completed their MA in Archaeology. Archaeological study programme gradually matured and finally the University

authority gave permission to open an independent Department of Archaeology. So, in 1991 the Department of Archaeology came into being and since then it has been working as a full-fledged department. Archaeological study which remained almost stagnant so long now may find new blood and new vigour. Now The Department of Archaeology, Jahangirnagar University offers 3-year BA Honours courses and 1-year post-Graduate courses, comprising both theoretical course works and practical or field works.

Besides the course works and routine curricular activities we wish to engage ourselves and our students in research archaeology and try to explore archaeological sites. With a view to increasing interest in Archaeological studies and research among teachers and others the Department has introduced a monthly seminar programme from January 1994 in which we are trying to follow an inter-disciplinary approach, and this programme is continuing to date.

The Department also wishes to publish an annual research journal from this year and the present journal pratnatatta (meaning archaeology) is the result of a relevant decision. We know our limitations. The Archaeology Department is still in its infancy. Our knowledge and experience are very limited. Notwithstanding this, we have begun, and we hope to learn from and improve with the counsel, suggestions etc from our learned readers and well-wishers.

I am very much grateful to the contributors for their learned articles. I think their papers will be of much help to the teachers, students and lovers of archaeology.

Exicutive Editor

প্রত্নতত্ত্ব

PRATNATATTA
Volume 1 June 1994

Contents

শাহ সুফি মোস্তাফিজুর রহমান	বাংলাদেশে প্রত্নতাত্ত্বিক চর্চা ঃ একটি সমীক্ষা	9-31
Dr. M. M. Hoque	Neolithic Settlement Pattern of The Lower Ganga Plain	32-43
ড. আফরোজ আকমাম	সম্প্রতি সংগৃহীত পোড়ামাটি বিষ্ণুঃ বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন	44-47
Dr. Olivier Guillaume	Ai Khanum : a Greek city in Afganistan	48-52
ড. এ. কে. এম.শাহনাওয়াজ	সুলতানি বাংলার শিলালিপি : বৈশিষ্ট্য ও ভূমিকা	53-65
Dr. Syed M. K. Ahsan	A Review of Research on Archaeological site Formation Process	66-78
অসিত বরণ পাল	প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন জনপদ এবং এখানে প্রাপ্ত পোড়ামাটির শিল্পকর্ম	79-92

Contributors :

Shah Sufi Mostafizur Rahman
Lecturer, Archaeology Department, J. U

Dr. M. M. Haque
Asistant Professor, Archaeology Department, J. U

Dr. Afroz Akmam
Deputy Keeper Incharge
History and Classical Art Devision Bangladesh National Museum

Dr. Olivier Guillaume
Director, Centre for Human
Sciences Embassy of France

Dr. A. K. M. Shahnawaz
Asistant Professor, Archaeology Department, J. U

Dr. Syed M. K. Ahsan
Asistant Professor, Archaeology Department, J. U

Ashit Baran Paul
lecturer, Archaeology Department, J. U

বাংলাদেশে প্রত্নতাত্ত্বিক চর্চা ঃ একটি সমীক্ষা

শাহ সুফি মোস্তাফিজুর রহমান

বরাবরই এদেশে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে প্রত্নতত্ত্ব চর্চার তেমন সুযোগ ছিলনা, বৃটিশ ও পাকিস্তানী শাসন যুগে সীমিত সরকারী উদ্যোগে খুব সামান্যই চর্চা হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশেও সরকারী উদ্যোগ ব্যাপক বিস্তারিত হয়নি। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে খুব অল্পই প্রত্নতত্ত্ব পাঠের অবকাশ রয়েছে। নতুন বিভাগ হিসেবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে উচ্চতর পাঠদানের সুযোগ হয়েছে মাত্র। তাই বাংলাদেশে প্রত্নতত্ত্ব চর্চার স্বরূপ অন্বেষণ একটি জটিল প্রয়াস। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে আমরা বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও অবস্থান থেকে যেভাবে প্রত্নতত্ত্ব চর্চা হয়েছে তারই একটি চিত্র উপস্থাপনের চেষ্টা করবো।

প্রত্নতত্ত্ব মানুষের ব্যবহৃত এবং প্রভাবিত সমস্ত বস্তুগত নিদর্শন চর্চার মাধ্যমে ইতিহাস রচনা করে। এই বস্তুগত নিদর্শন শুধুমাত্র মানব সমাজের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত জিনিসপত্র যেমন — বাসন-কোসন, হাতিয়ার বা ঘরবাড়ী নয়, তার পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির উপর মানুষ জীবিকার তাগিদে যে স্বাক্ষর রেখেছে বা প্রকৃতি মানুষের জীবনকে বিভিন্ন সময়ে যেভাবে প্রভাবিত করেছে তাও এই বস্তুগত নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। তাই প্রত্নতাত্ত্বিককে মানব ব্যবহৃত বিভিন্ন বস্তুগত নিদর্শন এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ যা সৃষ্টির প্রথম থেকে বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপের প্রভাবে বর্তমান আকৃতি প্রকৃতি নিয়েছে তা অনুসরণের মাধ্যমে ইতিহাস রচনা করতে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ইতিহাস রচনার জন্য ঐতিহাসিকগণ লিখিত তথ্যের উপর নির্ভরশীল এবং এই লিখিত তথ্যের মাধ্যমে তাঁরা বড়জোড় পাঁচ থেকে সাত হাজার বছরের ইতিহাস রচনা করতে পারেন। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বস্তুগত নিদর্শন চর্চার মাধ্যমে মানুষের ইতিহাস দুই থেকে তিন মিলিয়ন বৎসর পিছিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন।

ইতিহাস চর্চায় প্রত্নতত্ত্ব অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মতো কাজ করছে। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে যত বেশী সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় শুধুমাত্র লিখিত উপাদানের

মাধ্যমে তা পাওয়া সম্ভব নয়। উপরন্তু প্রত্নতত্ত্ব জনজীবনের ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দিয়েছে। সাধারণ মানুষ কিভাবে জীবন কাটাতো, কি প্রযুক্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করতো, কোন কোন প্রাণীর মাংস বা শস্য খেতো ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর লিখিত ইতিহাস থেকে খুব সামান্যই পাওয়া যায়। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আহৃত প্রত্নতাত্ত্বিক বিভিন্ন তথ্য আমাদের এই উত্তরগুলো স্পষ্টভাবে পাইয়ে দেয়। সত্যিকার জনজীবনের ইতিহাস বা তার সংস্কৃতির সন্ধান একমাত্র প্রত্নতত্ত্বের মাধ্যমেই পাওয়া যেতে পারে।

অনেকে বলে থাকেন যে, প্রত্নতত্ত্ব শুধুমাত্র প্রাক-ইতিহাস (Pre history) চর্চা করে কিন্তু বস্তুত তা সঠিক নয়। প্রত্নতত্ত্ব তথা বস্তুগত নিদর্শনের মাধ্যমে ইতিহাস রচনা সর্বপর্যায়ে সম্ভব। লিখিত উপাদান পাওয়ার পরেও প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের গুরুত্ব কমে যায়নি। কারণ অনেক সময় লিখিত উপাদানের ব্যপ্তি অনেকাংশে সীমিত। যেমন– লিখিত তথ্যের উপর নির্ভর করে কোন সমাজের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার্য জিনিসের পর্যালোচনা বিশদভাবে সম্ভব নয়। মধ্যযুগের ইতিহাসের লিখিত উপাদানগুলো থেকে জানা যাবে না সাধারণ মানুষ ঠিক কি ধরণের দ্রব্যাদি ব্যবহার করত। এই ধরণের জিনিস সম্পর্কে ঐতিহাসিক যুগেও প্রত্নতাত্ত্বিকের অবদান অপরিসীম। অন্যভাবে ঐতিহাসিক যুগেও মানুষের বসতি বিন্যাসের স্বাক্ষর ইতিহাসের লিখিত উপাদান থেকে বিশদভাবে জানা যাবে না; এটি জানতে গেলে প্রত্নতাত্ত্বিক তদন্ত সবচেয়ে ভাল পন্থা। বর্তমান যুগে বিশেষত অষ্টাদশ, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শিল্প নিদর্শনগুলোর ক্ষেত্রে প্রত্নতাত্ত্বিক পদ্ধতি ভালোভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। বর্তমানে প্রত্নতত্ত্বে আবহাওয়া সম্পর্কিত বহু বৈজ্ঞানিক আলোচনার অবতারণা হয়েছে। এই আলোচনায় প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দিতে পারে। যে কোন অঞ্চল, ঐ অঞ্চলে মানুষের উদ্ভব অথবা আগমনের পরে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন মানব গোষ্ঠী কর্তৃক কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, প্রত্নতাত্ত্বিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে রচিত সেই ইতিহাস এই অঞ্চলের উৎপাদনগত বর্তমান বিভিন্ন সমস্যাকেও বুঝতে সাহায্য করে।

বিশ্বে প্রত্নতত্ত্ব চর্চা ঃ প্রত্নতত্ত্ব চর্চার ইতিহাস খুব পুরনো দিনের নয়। পদ্ধতিগতভাবে প্রত্নতত্ত্ব চর্চার বয়স প্রায় একশত পঞ্চাশ বৎসর।[১] উপরোক্ত সময়ের পূর্বেও প্রত্নতত্ত্ব চর্চা ছিল। তবে তা ছিল ভিন্ন আঙ্গিকে। ব্যাবিলনের শেষ রাজা নাবোনিডাস (৫৫৫–৫৩৮ খ্রীঃ পূর্বাব্দ) কে প্রথম প্রত্নতাত্ত্বিক বলা হয়। তিনি ব্যবিলনের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং খনন করে প্রাচীন ইমারত ও সম্পদ উদ্ধার করে তা জনসাধারণকে অবহিত করানোর জন্য যাদুঘরে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন।[২] এর প্রায় দু'হাজার বৎসর পর পঞ্চদশ শতকে ইউরোপে রেনেসাঁ শুরু হয়। ঠিক এই সময় ইউরোপের অভিজাত

সম্প্রদায়, যাজক, প্রভৃতি শ্রেণী প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহের জন্য আগ্রহী হন। অনুসন্ধান এবং খনন করে প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহ শুরু এবং সংগৃহীত প্রাচীন নিদর্শন দিয়ে বাড়ীঘর সাজানোর মাধ্যমে এক ধরণের আভিজাত্যের প্রতিযোগিতা চলতে থাকে।[৩] কখনো কখনো অভিজাত শ্রেণী বা যাজকরা নিজেদের তত্ত্বাবধানে অনুসন্ধান বা খনন করে প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহ করলেও মূল সংগ্রাহক ছিল পেশাদার চোর, ডাকাত বা লুণ্ঠনকারী। কারণ চড়া দামে এসব প্রাচীন নিদর্শন বিক্রি হত। ফলে অর্থ লোলুপদের দ্বারা অনেক প্রাচীন কীর্তি চিরতরে ধ্বংস হয়। বেলজনী নামক এক দুর্ধর্ষ লুণ্ঠনকারী কিভাবে মিশর এবং মেসোপটেমিয়ায় মমি এবং অন্যান্য প্রত্নকীর্তি ধ্বংস করেছিল তার বর্ণনা পাওয়া যায়।[৪] ইউরোপে প্রত্নতত্ত্বের চর্চা অভিজাত বা যাজকদের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে শুরু হলেও কালের বিবর্তনে আজকাল প্রত্নতত্ত্ব একটি পরিপূর্ণ জ্ঞানের শাখা হিসেবে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে সম্পন্ন হচ্ছে এবং মানব সভ্যতার অনেক অজানা তথ্যকে উন্মোচিত করে জ্ঞানের ভান্ডার সমৃদ্ধ করছে।

ভারতবর্ষে প্রত্নতত্ত্ব চর্চা ঃ ভারতবর্ষে প্রত্নতত্ত্ব চর্চা শুরু হয় ষোড়শ শতকে। এই সময় কিছু কিছু ইউরোপীয় পর্যটক ভারত বর্ষের বিভিন্ন প্রত্নকীর্তি ইলোরা, এলিফেন্টা, কানহেরী প্রভৃতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন।[৫] এগুলোই ভারতবর্ষের প্রথম প্রত্নতাত্ত্বিক সাহিত্য।[৬] উপরোক্ত প্রক্রিয়া অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল; তবে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ভারতবর্ষে পদ্ধতিগত প্রত্নতত্ত্ব চর্চা শুরু হয়।[৭] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিক-ভূগোলবিদ প্লিনি, টলেমী, লিভি, মেগাস্থিনিস প্রভৃতির বর্ণনার মাধ্যমে ইউরোপীয় চিন্তা মানসে ভারতবর্ষের প্রাচীন নগর, নদী, পর্বত ইত্যাদি সম্পর্কে একটি ধারণা বরাবরই ছিল। প্রথম দিকের গবেষকদের লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন প্রত্নকীর্তির বিবরণের সাথে সাথে প্রাচীন সাহিত্যে, ইতিহাসে এবং ভৌগোলিক বিবরণে উল্লিখিত স্থানসমূহ সনাক্ত করা। এসব গবেষণার চূড়ান্তরূপ পায় ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জেমস রেনেল কর্তৃক প্রকাশিত 'Memoir of a Map of Hindoostan'এ। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত উপরোক্ত বইয়ের তৃতীয় সংস্করণে প্রাচীন সাহিত্যে উল্লিখিত পাটালীপুত্র নগরীর সঙ্গে আধুনিক পাটনা শহরকে সনাক্ত করা হয়। একথা বলা হয়ে থাকে যে, ভারতবর্ষে প্রত্নতত্ত্ব চর্চার সূত্রপাত এই ঘটনা থেকে শুরু হয়। ইতোমধ্যে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারক উইলিয়াম জোন্সের প্রচেষ্টায় ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী কলিকাতায় 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে পুরাকীর্তি গবেষণার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান তৈরী হয়, যা প্রত্নতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক হিসেবে স্বীকৃত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে কলিকাতায় প্রাচীন ইতিহাস,

ঐতিহ্য, প্রত্নবস্তু সম্পর্কে তথ্য পাঠাতে থাকে। ফলে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে 'এশিয়াটিক রিসার্সেস' নামক একটি গবেষণা পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। বলা হয়ে থাকে যে, ব্রিটিশদের ভারতবর্ষে প্রত্নতত্ত্ব চর্চার মূল কারণ তিনটি– প্রথমত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, ভারতবর্ষকে শাসন ও শোষণ করতে হলে তার শিকড় খুঁজতে হবে। তার ইতিহাস, আইন, আচার, আচরণ প্রভৃতি বুঝতে হবে। দ্বিতীয়ত বৃটিশ যাদুঘরের জন্য প্রত্নবস্তু সংগ্রহ করাও লক্ষ্য ছিল তৃতীয়ত উইলিয়াম জোন্সের লক্ষ্য ছিল বাইবেলের সূত্রানুসারে ভারতবর্ষকে পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা।[৮]

উইলিয়াম জোন্স নিজে প্রত্নতাত্ত্বিক ছিলেন না। ফলে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রত্নকীর্তি আবিষ্কার ব্যতীত তেমন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক কাজ হয়নি।[৯] বিভিন্ন প্রত্নকীর্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ করার মতো 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলে'র যে সীমিত কাজ ছিল তাও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসৃত হত না; বরং তার মধ্যে কিংবদন্তীর সংমিশ্রণ হত।[১০]

১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস উইলকিন্স সে যুগের অবোধ্য 'গুপ্ত' ও 'কুটিল' লিপির পাঠোদ্ধারের পন্থা প্রদর্শন করেছিলেন। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে বুকাননকে এদেশের ভূসংস্থান, ইতিহাস এবং প্রত্নবস্তু সমূহ পর্যবেক্ষণ করার জন্য নিয়োগ করা হয়। তবে তিনি তার রিপোর্ট প্রকাশ করেননি। কিন্তু ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মন্টগোমারি মার্টিন বুকাননের রিপোর্টের কিছু অংশ প্রকাশ করেন।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা টাকশালের কর্মকর্তা জেমস প্রিন্সেপ 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। প্রিন্সেপের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়া ইংরেজরা পুরাবস্তু সম্পর্কে তাঁদের নিজ নিজ পর্যবেক্ষণের ফল সোসাইটির জার্ণালে প্রকাশ করতে থাকেন। তিনি ১৮৩৪–৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 'ব্রাহ্মী' এবং 'খরোষ্ঠী' লিপি পাঠোদ্ধার করেন। এই দু'ধরনের লিপি পাঠোদ্ধার হওয়ার ফলে বিভিন্ন প্রত্নবস্তুতে উৎকীর্ণ অভিলেখ পাঠ করা সম্ভব হয়। শিলালিপি এবং প্রাচীন মুদ্রা নিয়ে গবেষণা শুরু হওয়ার পর প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজবংশ সমূহের ইতিবৃত্ত এবং সন তারিখের ধারণা স্পষ্ট হয় এবং সেই সঙ্গে প্রাচীন প্রত্নবস্তুগুলির সন তারিখ সম্পর্কেও অনেক ধারণা পাওয়া যায়। বস্তুত প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রত্নতত্ত্ব চর্চা জেমস প্রিন্সেপের ব্যক্তিগত গবেষণা এবং উদ্যোগের ফলস্বরূপ অনেক সুসংহত এবং বিস্তৃত হয়েছিল।

জেমস ফার্গুসন ১৮২৯–৪৭ খ্রীঃ পর্যন্ত ভারতবর্ষের স্থাপত্য কীর্তিসমূহ জরীপ করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা কোম্পানীর হাত থেকে ব্রিটিশ সরকারের হাতে অর্পিত হয়। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে 'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব

ইণ্ডিয়া' প্রতিষ্ঠিত হলে স্যার আলেকজাণ্ডার ক্যানিংহাম এর দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। মাঝখানে ১৮৬৬–৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচ বৎসর 'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া'র কার্যক্রম বন্ধ ছিল। ক্যানিংহাম ১৮৬১–৬৬ খ্রীষ্টাব্দ এবং ১৮৭০–৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট প্রায় চব্বিশ বৎসর উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান ছিলেন। তিনি এবং তাঁর তিনজন সহকারী কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো হাতীর পিঠে, কখনো ঘোড়ায় চড়ে আবার কখনোবা নৌকায় করে ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ এলাকা জরীপ এবং কখনো কখনো ক্ষুদ্রাকৃতির উৎখনন কাজও করতেন। ক্যানিংহামের উৎখনন পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত সরল মানের। আধুনিক প্রত্নতত্ত্বের স্তর বিন্যাসের ধারণা ক্যানিংহামের ছিল না, অবশ্য থাকার কথাও ছিল না। কারণ স্তর বিন্যাসের ধারণাটি পিট রির্ভাস পরবর্তীকালে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে প্রবর্তন করেন। ঐতিহাসিক-ভূগোল, রাজবৃত্ত, স্থাপত্যশিল্প, ভাস্কর্য চর্চা, মুদ্রা চর্চা, শিলালিপি চর্চা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ক্যানিংহামের অবদান ছিল পথিকৃতের। তাঁকে 'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া'র জনক এবং প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।[১১] ভারতবর্ষের প্রত্নতত্ত্বের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল জন মার্শালের (১৯০২–২৮ খ্রীঃ) 'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া'র মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ লাভ। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রত্নকীর্তি সংরক্ষণ' নামক একটি আইন প্রণয়ন তাঁর অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এরপর মহাপরিচালক নিযুক্ত হন এইচ, হারগ্রিভস (১৯২৮–৩১ খ্রীঃ), ডি, আর, সাহনি (১৯৩১–৩৫ খ্রীঃ)। জে, এ, এফ ব্লাকিষ্টন (১৯৩৫–৩৭ খ্রীঃ)। এবং কে, এন, দীক্ষিত (১৯৩৭–৪৪ খ্রীঃ)। ১৯৩০ এর দশকে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা ভারতবর্ষে প্রত্নতাত্ত্বিক চর্চাকেও কিছুটা ব্যাহত করেছিল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে অর্থনৈতিক মন্দা কিছুটা কাটিয়ে উঠলে ভারতবর্ষের প্রত্নতাত্ত্বিক কাজ মূল্যায়নের জন্য ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার লিওনার্ড উলিকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়ে আসা হয়। স্যার লিওনার্ড উলি প্রায় ৪৫টি প্রত্নস্থান পরিদর্শন শেষে ভারতবর্ষের প্রত্নতাত্ত্বিক চর্চায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন।[১২] তাঁর মতে ভারতবর্ষে প্রত্নতাত্ত্বিক কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ প্রত্নতত্ত্বের প্রতি নিবেদিত ছিলেন কিন্তু তাঁরা এবিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নন।[১৩] এতদিন ভারতবর্ষের প্রত্নতাত্ত্বিকরা অপেশাদারদের মতো শুধুমাত্র উপরের স্তর সরিয়ে প্রত্নকীর্তির কাঠামো উন্মোচণ করেছেন, তাঁরা প্রাকৃতিক ভূমিস্তর (Natural soil) পর্যন্ত যাননি।[১৪] প্রত্নতত্ত্বের এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য উলির পরামর্শে স্যার মর্টিমার হুইলার ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে 'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার' মহাপরিচালক নিযুক্ত হন। এই সময় থেকে ভারতবর্ষের প্রত্নতাত্ত্বিক চর্চা বৈজ্ঞানিক যুগে প্রবেশ করে। তিনি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষ প্রত্নতাত্ত্বিক তৈরীর জন্য 'লণ্ডন স্কুল অব আর্কিওলজি' এর অনুকরণে 'টেক্সিলা ট্রেনিং স্কুল অব আর্কিওলজি' প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানে অনেক বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিকের জন্ম হয় যাঁরা পরবর্তীকালে ভারত এবং

পাকিস্তানে যোগ্যতার সাথে প্রত্নতত্ত্ব চর্চা করেছেন। স্যার মার্টিমার হুইলার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান কাজ করেছিলেন এবং উৎখননে পিট রির্ভাস উদ্ভাবিত স্তর বিন্যাস পদ্ধতি অবলম্বন করেন। অনুসন্ধান এবং উৎখননের বিভিন্ন পর্যায়ে আলোকচিত্র, বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য ব্যাখ্যার জন্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সাহায্য গ্রহণ এবং সর্বোপরি রিপোর্ট প্রকাশ করে ভারতবর্ষের প্রত্নতত্ত্বে স্বর্ণযুগের সূচনা করেন। তাঁকে ভারতবর্ষের 'আধুনিক প্রত্নতত্ত্বের জনক' বলা হয়।

বাংলাদেশে প্রত্নতত্ত্ব চর্চা ঃ বাংলাদেশে প্রত্নতত্ত্ব চর্চা বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে হয়েছে। এর একটি চিত্র থাকলে প্রত্নতাত্ত্বিক কর্মকাণ্ডের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব। আমরা নীচে সে বিষয়ই আলোকপাত করছি।

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ঃ এ অঞ্চলে প্রত্নকীর্তি অনুসন্ধানে আমরা সর্ব প্রথম এগিয়ে আসতে দেখি ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিলটনকে। ইনি ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে মহাস্থান, পাহাড়পুর প্রভৃতি অঞ্চলের প্রত্নকীর্তি সম্পর্কে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। এই দুই অঞ্চলের প্রত্নকীর্তি সম্পর্কে পরবর্তীকালে বর্ণনা দেন ই. ভি. ওয়েষ্টম্যাকট (১৮৭৫ খ্রীঃ), এইচ বেভেরাইজ (১৮৭৪ খ্রীঃ) এবং সি. জে. ও. ডোনেল (১৮৭৫ খ্রীঃ)। ১৮৭১–৭২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের প্রত্নতত্ত্বের জনক স্যার আলেকজাণ্ডার ক্যানিংহাম প্রথমবারের মত এক সংক্ষিপ্ত সফরে বাংলায় আসেন। তিনি ১৮৭৯–৮০ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয়বারের মতো এদেশে এসে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নকীর্তি অনুসন্ধান এবং সীমিত আকারে উৎখনন করেন। তাঁর রিপোর্ট'এ[১৫] বাংলার যে সমস্ত প্রত্নকীর্তির বর্ণনা রয়েছে সেগুলোর মধ্যে গৌড়ের বিভিন্ন স্থাপত্যকীর্তি[১৬] দেবীকোর্ট[১৭] ক্ষেতলাল[১৮] ভাসুবিহার[১৯] মহাস্থান[২০] পাহাড়পুর[২১] ঢাকা[২২] বিক্রমপুর[২৩] সোনারগাঁও[২৪] প্রভৃতি। 'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার' প্রথম পরিচালক ক্যানিংহাম বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা সত্ত্বেও কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও নৌকায়, কখনও হাতী বা ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ কাজ চালান। তিনি সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাং উল্লিখিত 'পো-সি-পো' বিহার এবং ভাসুবিহার অভিন্ন বলে যুক্তি দেখান।[২৫] তিনি মহাস্থানকে প্রাচীন পুন্ড্রবর্ধন হিসেবে সনাক্ত করেন।[২৬] স্যার আলেকজাণ্ডার ক্যানিংহাম— বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আবু ইমাম বলেন, "Cunningham was singularly successful in his quest and found the remains of the city in Mahastan— a brilliant identification."[২৭] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে মহাস্থানে প্রাপ্ত 'ব্রাহ্মী লিপি'তে ক্ষোদিত শিলালিপির আবিষ্কার কানিংহামের যুক্তিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দিয়েছে। ক্যানিংহাম টলেমি উল্লিখিত 'Tugma Metropolis এবং ঢাকা কে অভিন্ন মনে

করেন।[২৮]

ক্যানিংহাম বাঘ, সাপ এবং জঙ্গলপূর্ণ পাহাড়পুর ঢিবিতে হাতীর পিঠে চড়ে জরিপ কাজ চালান। তিনি সেখানে খুব সামান্য উৎখনন (Superficial excavation) করেন। তাঁর বড় ধরণের উৎখনন (Extensive excavntion) করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু ঢিবি এলাকার জমির মালিক বলিহারের জমিদার রাজা কিষাণ চন্দ্র রায় তাঁর কাজে বাঁধা প্রদান করেন।[২৯] ক্যানিংহাম বাংলার জমিদারদের সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা তৎকালীন জমিদারদের চিন্তা চেতনার পশ্চাদপদতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অথচ ইউরোপে পঞ্চদশ শতকেই ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি প্রচুর আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। ক্যানিংহামের পরে 'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকের পূর্বে বাংলার আর উল্লেখযোগ্য কোন জরিপ বা খনন করেনি। ১৯২২-২৩ খ্রীষ্টাব্দে 'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' পাহাড়পুর উৎখননে আংশিক আর্থিক সাহায্যদান করে। ইতোমধ্যে ১৯২৩-২৪ খ্রীষ্টাব্দে কে. এন. দীক্ষিত বাংলার বিভিন্ন স্থাপত্য কীর্তি এবং মূর্তি জরিপ করেন। ১৯২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্দে আর. ডি. ব্যানার্জি উত্তরবঙ্গের রংপুর এলাকা জরিপ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পাহাড়পুরের উৎখননে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে 'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' ১৯২৫-২৬ খ্রীষ্টাব্দে আর. ডি. ব্যানার্জির তত্ত্বাবধানে উৎখনন কাজ শুরু করে। এরপর এ দায়িত্ব আসে কে. এন. দীক্ষিতের উপর। দীক্ষিত ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতিবৎসর উৎখনন কাজ পরিচালনা করেন। তবে মাঝখানে ১৯৩০-৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উৎখনন করেন জি. সি. চন্দ্র। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কে. এন. দীক্ষিত পাহাড়পুর উৎখননের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশ করেন।[৩০] উৎখননে পাহাড়পুরে একটি সমৃদ্ধ বিহার আবিস্কৃত হয়, যা পালরাজা ধর্মপালের (C. 770-815 A. D.)-এর সময় নির্মিত হয়। পাহাড়পুর সম্পর্কে দিলিপ কুমার চক্রবর্তী বলেন, "The rich finds of the Paharpur excavation added on a large scale a glorious chapter to the history of east India."[৩১]

১৯২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দে দীক্ষিত মহাস্থান উৎখনন করেন। ১৯৩৪-৩৫ এবং ১৯৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এন. জি. মজুমদার মহাস্থানের গোকুলে 'লখীন্দর মেধ' এ উৎখনন চালিয়ে একটি মন্দির আবিষ্কার করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কুমিল্লার ময়নামতি অঞ্চলে সেনানিবাস তৈরীকালে প্রত্নকীর্তি ধ্বংস হচ্ছিল এবং সেই সময় 'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' টি. এন. রাম চন্দনের তত্ত্বাবধানে জরিপ কাজ পরিচালনা করে ১৮টি প্রত্নস্থান সংরক্ষণ করেন। এটিই ছিল আধুনিক বাংলাদেশে 'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া'-এর সর্বশেষ কাজ।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ বিভাগের পর পাকিস্তানের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ময়নামতি অঞ্চলে কিছু পদ্ধতিগত জরিপ পরিচালনা করেন। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ময়নামতি অঞ্চলে প্রায় নিয়মিত বাৎসরিক উৎখনন কাজ শুরু হয় এবং তা প্রায় ষাটের দশক ধরে চলে। ডঃ হারুনার রশীদ এর তত্ত্বাবধানে এই উৎখনন কাজে শালবন বিহার, কুটিলামুড়ার ত্রিরত্ন স্তূপ, চারপত্র মুড়ার বাসুদেবের মন্দির প্রভৃতি প্রত্নকীর্তি এবং প্রচুর পরিমাণে প্রত্নবস্তু আবিস্কৃত হয়। যাদের মধ্যে এগার (১১) টি তাম্রলিপি পাওয়া যায়; যা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার ইতিহাস নির্মাণে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দুঃখের বিষয় হলো উপরোক্ত উৎখনন সম্পর্কে 'পাকিস্তান আর্কিওলজিতে' শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয় এবং হারুনার রশীদের "The early History of southeast Bengal in the light of recent Archaeological material (1968)" শিরোনামে পি-এইচ. ডি. থিসিসে (অপ্রকাশিত) কিছু কিছু তথ্য থাকলেও মূল রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। এ প্রসঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের ভূতপূর্ব পরিচালক ডঃ নাজিমুদ্দিন জানান ময়নামতি খননের সকল দলিল দস্তাবেজ তৎকালীন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান কার্যালয় করাচীতে আটকা পড়ায় তা আর প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।[৩২] কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর পাকিস্তান থেকে সে সমস্ত রিপোর্ট ফেরৎ নিয়ে আসার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। স্যার মার্টিমার হুইলারের মতে আধুনিক প্রত্নতত্ত্বে প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বা উৎখনন করে তার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশ না করা একটি মহা অপরাধ।[৩৩]

ষাটের দশকে ময়নামতি ব্যতীত মহাস্থানেও কিছু কিছু উৎখনন কাজ হয় এবং 'পাকিস্তান আর্কিওলজিতে' সংক্ষিপ্তাকারে আংশিক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। পাকিস্তান আমলে অন্যান্য ক্ষেত্রের মত প্রত্নতাত্ত্বিক ক্ষেত্রেও পূর্বপাকিস্তান সীমাহীন বৈষম্যের শিকার হয়। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের আটটি শাখার মধ্যে শুধুমাত্র একটি শাখা East Pakistan circle for conservation ব্যতীত সমস্ত শাখার প্রধান কার্যালয় ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে।[৩৪] ১৯৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ছিল ৩০,৯৬,০০০ টাকা। এরমধ্যে মাত্র ৪,৭৭,৩০০ টাকা বরাদ্দ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জন্য।[৩৫] ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রত্নতাত্ত্বিক রাউল কিউরেলের নেতৃত্বে ইউনেস্কোর একটি দল পাকিস্তানের প্রত্নকীর্তি পর্যবেক্ষণ করে জরিপ, উৎখনন, সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে হতাশা প্রকাশ করেন।[৩৬] ইউনেস্কোর রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তানের প্রত্নতাত্ত্বিক উন্নয়নের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয় এবং এই কমিটি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৬·৫৩ কোটি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ৫ কোটি টাকা বরাদ্দের সুপারিশ করেন।[৩৭] কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর গঠিত হয়ে কিছু উ ৎখনন কাজ করে। এগুলোর মধ্যে দিনাজপুর জেলার 'সীতাকোট বিহার', ময়নামতির' আনন্দ বিহার', বগুড়া জেলার 'বাসুবিহার', প্রভৃতি। উপরোক্ত উৎখননের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। তবে রিপোর্টের একটি সারাংশ বাংলাদেশ আর্কিওলজি নম্বর-১, ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[৩৮] এরপর বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে কি হচ্ছে তা বোঝা যায় না। কারণ এপর্যন্ত কোন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। উল্লেখ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশের কোন ব্যবস্থা নেই। প্রকাশনার এই সভ্য যুগে বসবাস করে ভাবতে অবাক লাগে যে, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের কোন নিয়মিত প্রকাশনা নেই। অনিয়মিত প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে ডঃ নাজিমুদ্দিন আহমেদের মহাস্থান ময়নামতি পাহাড়পুর।[৩৯] পাহাড়পুর,[৪০] মহাস্থান।[৪১] এ কে এম শামসুল আলমের ময়নামতি,[৪২] লালবাগ দুর্গ ও যাদুঘর।[৪৩] এম এ কাদিরের পাহাড়পুর।[৪৪] ডঃ হারুনার রশীদের পাহাড়পুর।[৪৫] প্রকাশনাগুলি নিঃসন্দেহে গাইড বই মাত্র। এগুলোকে রিপোর্ট বলার কোন অবকাশ নেই। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্র পরিদর্শন করে এবং অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় যে, ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দের পর প্রায় প্রতি বছর প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তর উৎখনন কাজ করেছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ময়নামতির 'ইটাখোলামুড়া' 'রূপবান মুড়া' মহাস্থানের 'দূর্গ প্রাচীর', ভাসুবিহারের কাছে 'বিহার' খুলনার 'ভারত বায়না', নেত্রকোনার 'রুয়াইল বাড়ী (কোর্টবাড়ী), সাভারের 'হরিশচন্দ্রের ঢিবি' প্রভৃতি। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর জরিপ এবং সংরক্ষণ কাজও করে থাকেন। এ পর্যন্ত তাঁদের প্রকাশিত রিপোর্ট হলো 'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে রিপোর্ট বগুড়া।'[৪৬]

১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইউনেস্কো এবং ইউ.এন.ডি.পি. পাহাড়পুর এবং বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ সংরক্ষণ প্রজেক্ট গ্রহণ করে বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব চর্চায় এক নবদিগন্তের সূচনা করে। কিন্তু বিশেষজ্ঞের অভাবে আশানুরূপ অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে না।

১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স বাংলাদেশ যৌথভাবে বাংলাদেশের প্রাচীনতম শহর পুন্ড্রবর্ধন তথা মহাস্থানে পাঁচ বৎসর মেয়াদী উৎখনন প্রকল্প হাতে নিয়েছে এবং ইতোমধ্যে উৎখনন কাজ শুরু করেছে। আমরা আশা করছি এখানে একটি আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফসল ফলবে।

বাংলাদেশ প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তরের অধীনে ময়নামতি, পাহাড়পুর, মহাস্থান, জাতিতাত্ত্বিক যাদুঘর, চট্টগ্রাম, শাহজাদপুর কুঠিবাড়ী যাদুঘর, চাখারে শেরে বাংলা ফজলুল হক যাদুঘর, যশোরে সাগরদাঁড়ি যাদুঘর, ময়মনসিংহ যাদুঘর, রংপুর যাদুঘর, লালবাগ দূর্গ যাদুঘর, রয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক অঞ্চলে আঞ্চলিক যাদুঘর থাকা নিঃসন্দেহে

বিভাগের মাথাভারী করা হয়েছে। অন্যান্য যাদুঘর বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরের অধীনে হস্তান্তর করে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর অধিকতর মনোযোগ দিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান, জরীপ, উৎখনন, রিপোর্ট প্রকাশ প্রভৃতি কাজ করতে পারে। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঢাকায় তাদের কোন কেন্দ্রীয় যাদুঘর নেই এবং সংগৃহীত নিদর্শন জাতীয় যাদুঘরের মাধ্যমে প্রদর্শনীর কোন ব্যবস্থাও নেই।

বাংলাদেশের কোন প্রত্নকেন্দ্রের রেডিও কার্বন (C—14) তারিখ নির্ধারিত হয়নি। উৎখননের সময় বৈজ্ঞানিক প্রত্নতাত্ত্বিক পদ্ধতি সমূহ খুব কম অনুসরণ করা হয়। প্রায় সমগ্র আধুনিক বিশ্ব যখন 'নিউ আর্কিওলজি'[৪৭] চর্চা নিয়ে ব্যস্ত ঠিক তখন আমরা বাংলাদেশে ট্রাডিশনাল আর্কিওলজি'ও[৪৮] করছি না। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতকের প্রত্নতাত্ত্বিক কাজের মতো স্তূপ, মঠ, মন্দির, মসজিদ প্রভৃতি প্রত্নকীর্তির পোড়া ইটের কাঠামো উদ্ধার এবং প্রত্নবস্তু সংগ্রহের মধ্যে তাদের কর্ম পরিধিকে সীমিত রেখেছে।[৪৯]

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা নেই যাতে করে গবেষণা এবং মাঠ পর্যায়ে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ পেশার প্রতি আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য তেমন কোন পদক্ষেপও গৃহীত হয়নি। কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও সীমিত। উপরন্তু সীমিত সংখ্যক অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মকর্তাদের তেমনভাবে কাজে লাগানো হয়নি। যেমন মাঠ পর্যায়ে দক্ষ প্রত্নতাত্ত্বিক এবং প্রকাশনায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অভিজ্ঞ ডঃ হারুনার রশীদকে দিয়ে যথেষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা করিয়ে নেয়ার সম্ভাবনা থাকলেও সে ব্যাপারে কোন উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। শুধুমাত্র পেশাদার প্রত্নতত্ত্ব অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মাধ্যমেই প্রত্নতত্ত্ব চর্চা সঠিক অর্থে সম্পাদিত হতে পারে। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরে নিয়োগের ক্ষেত্রে এদিকটি তে সুবিবেচনা হয় না বলে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা স্বাভাবিকভাবে শ্লথ হয়ে পড়েছে।

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সীমাবদ্ধতা ছাড়াও পুরাকীর্তি ধ্বংসের পেছনে এদেশের মানুষের অশিক্ষা ও অজ্ঞতাকেও দায়ী করা যায়। একদিক থেকে যেমন এরা পুরাকীর্তির গুরুত্ব অনুধাবন করতে না পেরে তা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মনযোগী হতে পারে না অন্যদিকে অধিক জনসংখ্যা জনিত সমস্যায় বাসযোগ্য জমির প্রয়োজনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ধ্বংস করে ফেলে। এছাড়াও লুটেরাদের দ্বারা প্রত্নক্ষেত্র গুলোর ইট ও গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নবস্তু অপসারণের মাধ্যমেও প্রত্নসম্পদ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি ঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিদ্বৎসাহীদের প্রচেষ্টায় কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার (১৮৯৩–৯৪ খ্রীঃ) মাধ্যমে

কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার (১৮৯৩-৯৪ খ্রীঃ) মাধ্যমে বেসরকারী পর্যায়ে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহের আগ্রহ দেখা দেয়। এটি যেন পঞ্চদশ শতকের ইউরোপীয় রেনেসাঁর যুগের আলোড়নের মতো। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, সিলেট এবং কুমিল্লায় খোলা হয়। সাহিত্য পরিষদ স্থানীয় ইতিহাস ঐতিহ্য সংগ্রহে ভূমিকা রাখে। মূর্তি সংগ্রহ অভিযান চলতে থাকে এবং স্থানীয়ভাবে যাদুঘর প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গৃহীত হয়।[৫০] ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে রমাপ্রসাদ চন্দ্র রাজশাহীর প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের উপর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বিহারের ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে শরৎকুমার রায়, অক্ষয় কুমার মৈত্র এবং রমাপ্রসাদ যোগদান করেন। সে সময় তাঁরা প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় এবং ভাগলপুরের জনৈক উকিল নরেশচন্দ্রের সঙ্গে ভাগলপুর এলাকার প্রত্নসম্পদ পরিদর্শন করেন। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রত্নসম্পদ দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং রাজশাহী অঞ্চলে এসে প্রত্নসম্পদ সংগ্রহের সংকল্প করেন।[৫১] ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে শরৎকুমার রায়ের অর্থানুকূল্যে কুমার স্বয়ং, অক্ষয় কুমার মৈত্র এবং আরো কয়েকজন রাজশাহীর গোদাগাড়ী অঞ্চলে অনুসন্ধান করে ৩২টি মূল্যবান মূর্তি সংগ্রহ করে বাংলাদেশে প্রত্নকীর্তি সংগ্রহের ভিত্তি স্থাপন করেন।১৯১০ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁরা জয়পুরহাট অঞ্চলের কাঞ্চনপুর এলাকায়ও প্রত্নকীর্তি অনুসন্ধান করেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁরা গঠন করেন 'বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি।' সোসাইটির কর্ম পরিধি নির্ধারিত হয় প্রত্নসম্পদ গবেষণা করা, বাংলা বিশেষ করে বরেন্দ্র অঞ্চলের অতীত ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণাই ছিল সোসাইটির মূল লক্ষ্য।[৫২] সোসাইটি১৯১১, ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় অনুসন্ধান কাজ চালান। সংগৃহীত প্রত্নবস্তু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বরেন্দ্র যাদুঘর স্থাপিত হয়। ১৯১১-১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি গাছিপুর, মাহীসন্তোষ, কুমারপুর দেওপাড়া প্রভৃতি স্থানে উৎখনন করে। বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় ১৯২২-২৩ খ্রীষ্টাব্দে দীঘাপাতিয়ায় জমিদার রাজা শরৎকুমার রায়ের অর্থানুকূল্যে প্রত্নতাত্ত্বিক ডি. আর. ভাণ্ডারকরের তত্ত্বাবধানে পাহাড়পুরে প্রথম বারের মত উৎখনন কাজ হাতে নেন। তাই বলা যায়, বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি শুধুমাত্র প্রত্নবস্তু অনুসন্ধান করেই ক্ষান্ত হয়নি, সেগুলো সংরক্ষণের জন্য বরেন্দ্র যাদুঘর স্থাপন এবং অধিকতর প্রত্নবস্তু সংগ্রহ এবং প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য উন্মোচনের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিকের তত্ত্বাবধানে পাহাড়পুর উৎখননেও অংশ নিয়ে এদেশে প্রত্নতত্ত্ব চর্চায় এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। ১৮৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে স্যার আলেকজাণ্ডার ক্যানিংহাম রাজশাহী অঞ্চলে বলিহারের জমিদার কিষাণ চন্দ্র রায় এবং বাংলার প্রায় সব জমিদারদের

প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে রাজশাহীরই জমিদার বাবু শরৎকুমার রায় এবং তাঁর পণ্ডিত বন্ধু অক্ষয় কুমার মৈত্র তা মিথ্যে প্রমাণ করেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি বরেন্দ্র যাদুঘর দেখাশোনা করে, তবে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দেই বরেন্দ্র যাদুঘরের দায়িত্বভার তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের হাতে চলে যায়।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে শরৎকুমার রায়ের মৃত্যু এবং ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত বিভাগের পর বরেন্দ্র যাদুঘরের সংগ্রহ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। যাদুঘরের পৃষ্ঠপোষক এবং সমর্থনদানকারী ব্যক্তিরা ভারতে অভিবাসন (Migrate) করলে প্রতিষ্ঠানটি নিদারুন অর্থ সংকটে পতিত হয়। ফলে দীর্ঘ কাল ধরে যাদুঘরের জন্য কোন আর্থিক অনুদান ছিল না এমনকি কোন সার্বক্ষণিক কিউরেটরও ছিলো না।[৫৩] উপরন্তু দেশ বিভাগের পর ধর্মান্ধ পাকিস্তান সরকার হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি ধ্বংসের জন্য যাদুঘরের ক্ষতিসাধন করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু স্থানীয় স্বদেশ প্রেমিকরা ডঃ শহীদুল্লাহর সহযোগিতায় মৌলবাদীদের হীনচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়।[৫৪] তবুও যাদুঘর ইমারতের কিছু অংশ রাজশাহী মেডিকেল কলেজের অঙ্গিভূত হয়ে যায়।

১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বরেন্দ্র যাদুঘরের দায়িত্বভার গ্রহণ করে। তবে ১৯৪৭–৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যাদুঘরের কর্মকর্তা ছিলেন একমাত্র একজন খন্ডকালীন কিউরেটর।[৫৫] ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক মোখলেসুর রহমানকে সার্বক্ষণিক কিউরেটর নিয়োগ করা হয় এবং বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর কিউরেটর পদকে পরিচালক পদে উন্নীত এবং সহকারী কিউরেটর, গবেষণা ফেলো, প্রভৃতি পদে লোক নেয়া হয়। অধ্যাপক মোখলেসুর রহমানের সম্পাদনায় 'জার্নাল অব দি বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম' নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। তবে 'বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি' তার শুরুতে যে রকম প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান এবং উৎখননে অংশ নিয়েছিল বর্তমানে বরেন্দ্র যাদুঘরের সেরকম কোন লক্ষ্য নেই। শুধুমাত্র কোথাও কোন প্রত্নবস্তু পাওয়া গেলে তা সংগ্রহের চেষ্টা করা হয় মাত্র। এদিক থেকে বিবেচনা করলে বরেন্দ্র যাদুঘর প্রত্নতাত্ত্বিক চর্চাকে অনেকাংশে সীমিত করেছে। তবে ১৯১০–৮৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সংগৃহীত ৭, ৯৩২টি প্রত্নবস্তুর মধ্যে রয়েছে মুদ্রা, শিলালিপি, মূর্তি, পাণ্ডুলিপি, মৃৎপাত্র প্রভৃতি।[৫৬] বরেন্দ্র যাদুঘরে রক্ষিত উপরোক্ত প্রত্নবস্তুগুলি বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব চর্চায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং দেশ বিদেশ খ্যাত পণ্ডিতদের রচিত বরেন্দ্র যাদুঘরের প্রায় ৫০টি গ্রন্থ প্রকাশনা বাংলাদেশে প্রত্নতত্ত্ব চর্চায় এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

ঢাকা যাদুঘর/বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরঃ কোন দেশের প্রত্নতত্ত্ব চর্চায় যাদুঘরের ভূমিকা অপরিসীম। যাদুঘরের অন্যান্য বহুবিধ কার্যাবলী বাদ দিয়েও একটি কথা বলা যায়

যে, যাদুঘর তার সংগৃহীত প্রত্নবস্তুর প্রদর্শনী করে এবং প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে দেশের জনগণকে প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে সহজেই আকৃষ্ট করতে পারে।

'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া'র উদ্যোগে ভারত এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে অনেক যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হলেও তৎকালীন বাংলায় সেরকম কোন প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়নি। বাংলাদেশের সর্ব প্রাচীন যাদুঘর কোনটি তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও সূত্র মতে জানা যায় ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় একটি যাদুঘর স্থাপনের প্রস্তাব উথাপনের পর ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন সচিবালয় তথা আজকের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের এক ক্ষুদ্র পরিসর কক্ষে ঢাকা যাদুঘরের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তা নিমতলীর তিন হাজার বর্গফুট পরিসরের বারোদুয়ারী ভবনে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা যাদুঘর বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর নামে তিন লক্ষ বর্গফুট পরিসর ভবনে ঢাকা শহরের কেন্দ্রীয় স্থান শাহবাগে আবারও স্থানান্তরিত হয়।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে নলিনীকান্ত ভট্টশালী ঢাকা যাদুঘরের প্রথম কিউরেটর নিযুক্ত হন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৩৩ বৎসর ঢাকা যাদুঘরের সেবা তথা বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব চর্চায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। তাঁর কর্ম সম্পর্কে প্রফেসর এ.বি.এম. হাবিবুল্লাহর উক্তিপ্রণিধানযোগ্য।[৫৭]

বহুদিন পর্যন্ত ভট্টশালীর সাহায্যকারী হিসেবে কোন কেরানী ছিল না। এমনকি তার কোন টাইপিষ্ট পর্যন্ত ছিল না। তিনি নিজেই টাইপ করতেন, ছবি তুলতেন, সংগৃহীত বস্তুর হিসাব রাখতেন, মোট কথা সমস্ত কাজ কর্ম তাঁকেই করতে হতো।[৫৮] ভট্টশালী দুইশত টাকা মাসিক বেতনে কিউরেটর পদে যোগদান করেন এবং তেত্রিশ বৎসর পর তাঁর মাসিক বেতন দাঁড়ায় দুইশত ষাট টাকায়। শুধুমাত্র যাদুঘরের প্রতি ভালবাসার টানে প্রত্নতত্ত্বচর্চার জন্য আজীবন নিরলস পরিশ্রম করেছেন। তিনি প্রত্নতত্ত্বের উপর পাঁচটি গ্রন্থ এবং অসংখ্য গবেষণা প্রবন্ধ লিখে বাংলাদেশে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ভিত্তি রচনা করেছেন। ভট্টশালী রচিত 'Iconography of Buddist and Brahmanical sculptures in the Dacca Museum' একটি মৌলিক রচনা।[৫৯]

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভট্টশালীর মৃত্যুর পর ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকা যাদুঘর সাময়িকভাবে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে থাকে। ১৯৫১–৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকা যাদুঘর খন্ডকালীন অধ্যক্ষের অধীনে পরিচালিত হয়। খন্ডকালীন অধ্যক্ষের মধ্যে সবাই যোগ্যতার সাথে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন। এঁদের মধ্যে প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক অধ্যাপক আহমেদ হাসান দানী এবং অধ্যাপক আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহর অবদানের কথা স্মরণ করা যেতে পারে।

১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে সহকারী অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত ডঃ এনামুল হক ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্তি লাভ করেন। মূলত ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই ঢাকা যাদুঘরে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান আমলে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো যাদুঘরও সরকারী আর্থিক বৈষম্যের শিকার হয়। ঢাকা যাদুঘরের জন্য বার্ষিক বাজেট ছিল ৩,৯০০·০০ টাকা এবং করাচী জাতীয় যাদুঘরের জন্য বার্ষিক বাজেট ছিল ৪,০০,০০০·০০টাকা।[৬০] এমনকি তক্ষশিলা যাদুঘরের বাগান পরিচর্যার জন্য ব্যয় হত বার্ষিক ২৯,০০০·০০ টাকা।[৬১] উপরের তথ্য থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে আর্থিক কারণে ঢাকা যাদুঘরের কর্মপরিধি অনেক সীমিত থেকেছে। তবে ১৯৬২–১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ডঃ এনামুল হকের প্রচেষ্টায় যাদুঘরের জন্য সরকারী ব্যায় বরাদ্দ যেমন বেড়েছিল তেমনি চাঁদা সংগ্রহের মাধ্যমেও আর্থিক সমস্যার অনেকটা সমাধান করা হয়েছিল।[৬২] এসময়ে ঢাকা যাদুঘর কর্তৃক আয়োজিত দেশী বিদেশী পণ্ডিতদের দ্বারা সেমিনার অনুষ্ঠান যেমন, লন্ডনের শিল্পকলা-ঐতিহাসিক ঃ জর্জ মিশেল কর্তৃক 'পোড়ামাটির স্থাপত্য' (১৯৮৪ খ্রীঃ), এ এইচ দানী কর্তৃক 'দক্ষিণ এশিয়ায় সাম্প্রতিক ইতিহাস গবেষণা প্রবণতা' (১৯৮৫ খ্রীঃ), যুক্তরাষ্ট্রের প্রফেসর ওলেগ গ্রাবার কর্তৃক 'ইসলামী স্থাপত্যের উৎস হিসেবে ইসলাম' (১৯৮৫ খ্রীঃ), ভি এন মিশ্র কর্তৃক 'প্রাগৈতিহাসিক মানুষ এবং মধ্য ভারতের শিল্পকলা' (১৯৮৬ খ্রীঃ), যুক্তরাষ্ট্রের ডঃ এনামেরী শিমেল কর্তৃক 'ইসলামী ক্যালিগ্রাফী' প্রভৃতি বক্তৃতা দান বাংলাদেশে প্রত্নতত্ত্ব চর্চার এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এছাড়া এ সময়ে ঢাকা যাদুঘরে প্রথম আন্তর্জাতিক 'বঙ্গীয় শিল্পকলা সম্মেলন' (১৯৭৬), 'বাংলাদেশে ইসলামী শিল্পকলা' শীর্ষক প্রদর্শনী (১৯৭৮), ফরাসী দূতাবাসের যৌথ উদ্যোগে প্যারিসের ল্যূর্ভ মিউজিয়াম থেকে প্রেরিত শিল্প কর্মের অনুকৃতীর প্রদর্শনী (১৯৮৭) প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়। এসব প্রদর্শনী অনুষ্ঠান বাংলাদেশে প্রত্নতত্ত্ব চর্চার একটি ব্যবহারিক দিকের ইঙ্গিত দেয়।

১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা যাদুঘরে পৃথিবীর প্রথম স্কুলবাস এবং ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী বাস সংযোজিত হয়।[৬৩] প্রত্নতত্ত্বকে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সম্মুখে উপস্থিত করা এবং ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী বাসের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দেশের অতীত ঐতিহ্য তুলে ধরার প্রচেষ্টা, প্রত্নতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহেএকটি মাইল ফলক। ১৯১৩ থেকে ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সংগৃহীত নিদর্শন সংখ্যা ছিল প্রায় উনিশ হাজার এবং ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সংগৃহীত নিদর্শন ছিল একষট্টি হাজার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ঢাকা যাদুঘর তথা জাতীয় যাদুঘরে (১৯৮৩ খ্রীঃ) সংগৃহীত সমস্ত নিদর্শন প্রত্নতাত্ত্বিক নয়, তবে অধিকাংশই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন।

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে একমাত্র কিউরেটর ডঃ এনামুল হক সহ অফিস কর্মচারী ছিলো সর্বমোট সাতজন, ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে এসে তা দাঁড়িয়েছে মহাপরিচালক সহ তিনশত সত্তুর জন। কর্মচারী সংখ্যা এত বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে যাদুঘরের ব্যাপক কর্মপরিধির তথ্য প্রদান করে। বর্তমানে যাদুঘরে একজন অনুসন্ধান কর্মকর্তা রয়েছেন। যিনি দেশের যে কোন স্থানে প্রত্ন নিদর্শনের খবর পেলে তাৎক্ষণিকভাবে তা সংগ্রহের চেষ্টা করেন। এছাড়া যাদুঘরের সমস্ত কর্মকর্তাকে বাৎসরিক নিদর্শন সংগ্রহ অভিযানে অন্তত একবার দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেতে হয়। ঢাকা যাদুঘর তথা জাতীয় যাদুঘর অনিয়মিতভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননেও অংশ গ্রহণ করে থাকে। যেমন- নলিনীকান্ত ভট্টশালী মুন্সিগঞ্জ জেলার রামপালের রঘুরামপুরে উৎখনন করেন। ঢাকা জেলার সাভারের রাজাশন ভিটা এবং ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সাভারের রাজা হরিশচন্দ্রের ঢিবিতেও উৎখনন চালানো হয়। যাদুঘরের প্রাক্তন মহাপরিচালক ডঃ এনামুল হক বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাহায্যে অনেক প্রত্নকেন্দ্র জনসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরেন। বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থ এবং অনিয়মিত সংকলন প্রকাশ করে প্রত্নতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রত্নতত্ত্ব চর্চা : রেনেসাঁর সময় থেকে ইউরোপে ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহের প্রচেষ্টা দেখা দিলেও ভারতের ক্ষেত্রে সেরকমটি ঘটেনি।[৬৪] অথচ এই প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহের আগ্রহ থেকেই ক্রমে আজকের বৈজ্ঞানিক প্রত্নতাত্ত্বিক চর্চার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে।[৬৫] তবে আশার কথা এই যে পরবর্তীতে অষ্টাদশ, উনবিংশ শতকের দিকে ভারতবর্ষেও ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহের প্রচেষ্টা শুরু হয় এবং বাংলাদেশে আমরা এই ধারার প্রথম প্রকাশ দেখি ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে। এসময় দীঘাপাতিয়ার জমিদার শরৎ কুমার রায় তাঁর কয়েক বন্ধুর সহযোগিতায় রাজশাহী অঞ্চলে অনুসন্ধান চালিয়ে বত্রিশটি মূর্তি সংগ্রহ করেন। শরৎ কুমার রায়ের প্রচেষ্টায় এবং আর্থিক সহায়তায় বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি এবং বরেন্দ্র যাদুঘর গড়ে উঠেছিল তা আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে দেশের ঐতিহ্য প্রিয় বলধা জমিদার বাবু নরেন্দ্র নারায়ণ রায় ঢাকায় বলধা সংগ্রহশালা গড়ে তোলেন। বলধা সংগ্রহশালায় প্রাচীন মুদ্রা, হাতীর দাঁতের শিল্পকর্ম, কাঠ ও ধাতব শিল্প নিদর্শন এবং বিশেষ করে মধ্যযুগের ইন্দো পারসীয় হাতিয়ারের এক সমৃদ্ধ সংগ্রহ ছিল। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে এই উদার ঐতিহ্য প্রিয় জমিদারের মৃত্যু হলে বলধা সংগ্রহশালা অযত্ন অবহেলার শিকার হয়। ফলে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সমস্ত সংগ্রহ তৎকালীন ঢাকা যাদুঘরে স্থানান্তরিত হয়।[৬৬] এভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রত্নতত্ত্ব চর্চা উদ্যোগী ব্যক্তির অভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে।

বাবু মহেশ ভট্টাচার্য নামে আরেক ঐতিহ্য প্রিয় ব্যক্তি ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে কুমিল্লা শহরে রামমালা নামে একটি সংগ্রহশালা গড়ে তোলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রামমালা ভবন সেনা ছাউনী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফলে সংগ্রহশালা এতই ক্ষতিগ্রস্থ হয় যে সংগৃহীত একহাজার প্রত্ন নিদর্শনের মধ্যে বর্তমানে মাত্র চুরাশিটি অবশিষ্ট রয়েছে।[৬৭] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বরেন্দ্র রিসার্চ যাদুঘর প্রতিষ্ঠায় বাবু শরৎ কুমার রায়কে তাঁর পণ্ডিত বন্ধু অক্ষয় কুমার মৈত্র যেরকম সহযোগিতা করেছিলেন, রামমালা যাদুঘর এবং পাঠাগারের অধ্যক্ষ রাস মোহন চক্রবর্তী মহেশ ভট্টাচার্যকে অনেকটা সেরকম সহযোগিতা করেছিলেন। সিলেট, বগুড়া প্রভৃতি স্থানে স্থানীয়ভাবে যাদুঘর গড়ে উঠলেও বর্তমানে সেগুলো বিলুপ্ত এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোন যাদুঘর হচ্ছে না। তবে ব্যক্তিগত ভাবে অনেকের কাছে সংগৃহীত প্রত্নবস্তু রয়েছে। এদেশে মুদ্রা ও শিলালিপির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও প্রকাশনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন মৌলভী শামসুদ্দিন আহমেদ এবং অধ্যাপক আহমদ হাসান দানী। মুদ্রা ও শিলালিপি পাঠোদ্ধারের মাধ্যমে তাঁরা বিশেষ করে সুলতানী ও মোগল যুগের অনেক অজানা তথ্য উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন। জনাব আ ক ম যাকারিয়ার কথা না বললে বাংলাদেশে প্রত্নতত্ত্ব চর্চার ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তিনি পেশাদার প্রত্নতাত্ত্বিক নন; কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব চর্চা তাঁর নেশা। সরকারী চাকুরীজীবি হিসেবে তিনি প্রায় সমগ্র বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ঘুরেছেন এবং অজ্ঞাত অজানা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রত্নকীর্তিগুলোকে যত্ন সহকারে পর্যবেক্ষণ করে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর রচিত 'বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ' গ্রন্থটি[৬৮] বাংলাদেশে প্রত্নতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা দিতে পারে। এবং তাঁর এই কাজ বাংলাদেশে প্রত্নতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আ ক ম যাকারিয়া দিনাজপুর যাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় জেলা বোর্ডের অর্থ দিয়ে দিনাজপুর সীতাকোট বিহারেও আংশিক উৎখনন হয়েছিল। কুমিল্লার কনক বিহারের মহাথেরো ধর্মরক্ষিত তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বিহারের একটি অংশে একটি ক্ষুদ্রাকৃতির যাদুঘর গড়ে তুলেছেন যা ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রত্নতত্ত্ব চর্চার একটি মহতী উদ্যোগ। একই সাথে উল্লেখ করা যায় প্রয়াত হাকিম হাবিবুর রহমান ও সৈয়দ মোঃ তাইফুরের নাম। তাঁদের সংগৃহীত প্রত্নবস্তু এবং লেখা প্রত্নতত্ত্ব চর্চাকে সমৃদ্ধ করেছে। অপেশাদার প্রত্নতাত্ত্বিক হয়েও জনাব হাবিবুল্লাহ পাঠান উয়ারী বটেশ্বরের মত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থান নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং গ্রন্থ রচনা করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন শিক্ষা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেকেই প্রত্নতাত্ত্বিক চর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এশিয়াটিক সোসাইটি ও বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব চর্চা ঃ ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় যে 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' প্রতিষ্ঠিত হয় তার অনুকরণে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ডঃ আবু মহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, ডঃ আহমেদ হাসান দানী, সৈয়দ মুহম্মদ তৈফুর প্রমুখ পণ্ডিত বর্গের নেতৃত্বে বাংলাদেশে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়।[৬৯] কিন্তু এই 'এশিয়াটিক সোসাইটি' কলকাতার 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের' মত প্রত্নতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে কোন অবদান রাখতে পারেনি। 'এশিয়াটিক সোসাইটি' কোন প্রত্নতাত্ত্বিক জরীপ ও উৎখননে অংশ নিয়েছিল এরকম তথ্য আমাদের হাতে নেই। তবে আশার কথা এই যে, সম্প্রতি এশিয়াটিক সোসাইটি 'A Survey of Historical monuments and sites in Bangladesh.' নামে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে।[৭০] কিন্তু প্রকল্পটি এখনও কোন ধরনের কাজ শুরু করেনি। 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রাচীন ইতিহাস, ঐতিহ্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং প্রকাশনার মাধ্যমে তাঁদের কাজ সীমাবদ্ধ রেখেছে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্নতত্ত্ব চর্চা ঃ প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে প্রত্নতত্ত্ব চর্চার জন্য ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'The Institute of Archaeology at London University' এর অনুকরণে উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে হুইলার ভারতবর্ষে, ' Taxila Training school of Archaeology' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৭ এ দেশ বিভাগের পর ভারতের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ষাটের দশকে পশ্চিম পাকিস্তানের পেশোয়ার, ইসলামাবাদ এবং করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ চালু হয়। কিন্তু সবদিক থেকে বঞ্চিত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ খোলা হয়নি। পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক আহমেদ হাসান দানীর নেতৃত্বে এম. এ. শ্রেণীতে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস গ্রুপে প্রত্নতত্ত্ব এবং স্থাপত্য নামে দু'টি কোর্স পাঠদান শুরু হয়। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রফেসর এ এইচ দানী পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে নতুন বিভাগ প্রতিষ্ঠার পথ রুদ্ধ হয়।[৭১] যার ফলে বাংলাদেশে প্রত্নতত্ত্ব চর্চা মূলত অপেশাদারদের হাতে চলে যায়। ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, ভূগোল, আরবী, প্রভৃতি বিষয়ে ডিগ্রী প্রাপ্তরা সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে যোগদান করেন। ফলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রত্নতত্ত্ব চর্চা খুবই সীমিত হয়ে পড়ে।

১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক আবু ইমামের প্রচেষ্টায় এবং মিঃ যোশীর সহযোগিতায় ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের অর্থানুকূল্যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে প্রত্নতত্ত্ব শাখা খোলা হয় স্নাতকোত্তর পর্যায়ে প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে পাঠদানের জন্য। ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রফেসর দিলীপ কুমার চক্রবর্তী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। তিনি পাঠদান ছাড়াও কখনও নিজ ব্যয়ে কখনও বা বিশ্ববিদ্যালয়ের

আর্থিক অনুদানে প্রায় সমগ্র বাংলাদেশে সংক্ষিপ্ত অনুসন্ধান কাজ পরিচালনা করেন। পরবর্তীকালে তিনি 'Ancient Bangladesh, A study of the Archaeological soures' নামক একটি গ্রন্থ[৭২] রচনা করেন। যা বংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশের প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব চর্চা আলোচনার পূর্বে বাংলাদেশে বিক্ষিপ্ত ভাবে আবিষ্কৃত কিছু প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা আবশ্যক। বাংলাদেশে কখনও পদ্ধতিগতভাবে প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব চর্চা হয়নি। কোন কোন প্রবন্ধে পণ্ডিতগণ কখনও কখনও অনুমানের উপর এ বিষয়ে মত প্রকাশ করেছেন। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক 'পূর্ব পাকিস্তানে প্রত্নতাত্ত্বিক কর্মতৎপরতা' প্রবন্ধে অভিমত প্রকাশ করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণাঞ্চল পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে যথেষ্ট আধুনিক হলেও এর উত্তরাঞ্চল পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে কোন অংশে আধুনিক নয়। এখানেও হরপ্পা বা মহেঞ্জোদাড়োর মত সভ্যতা আবিষ্কৃত হতে পারে।[৭৩] আবার অধ্যাপক মমতাজুর রহমান তরফদার 'পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্নতত্ত্ব' শিরোনামের প্রবন্ধে অভিমত ব্যক্ত করেন যে পূর্ব পাকিস্তানে অতি প্রাচীন কোন সভ্যতার নিদর্শন আশা করা যায় না। কারণ এর ভূমির গঠন নিতান্তই সাম্প্রতিক কালের ঘটনা।[৭৪] কিন্তু গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, বাংলাদেশের কোন কোন এলাকা/অঞ্চল যেমন, বরেন্দ্র ৭৬৮০ বর্গ কিলো, মধুপুর ৪০৫৮ বর্গ কিলো, লালমাই ৩৩ বর্গ কিলো, সিলেট এবং চট্টগ্রামের কিছু এলাকা প্লাইস্টোসিন যুগে গঠিত হয়েছিল।[৭৫] পণ্ডিতদের অভিমত যে প্লাইস্টোসিন যুগে আধুনিক মানুষ বসবাস করত। সেদিক থেকে উপরোল্লিখিত অঞ্চলসমূহে প্রাচীন মানুষের বসবাসের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষেও বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে দৈবাৎ প্রাপ্তি (Change Finding) হিসেবে প্রাগৈতিহাসিক কালের হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছিল। প্রফেসর হারুনার রশীদ লিখেন যে, ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ডাইসন নামে জনৈক আমেরিকান নাগরিক রাঙ্গামাটি এলাকায় প্রাপ্ত একটি প্রস্তরীভূত কাঠের (Fossilwood) হস্ত কুঠার তৎকালীন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কাছে হস্তান্তর করেন।[৭৬] ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে নোয়াখালী জেলার ছাগলনাইয়া অঞ্চলে একটি প্রস্তরিভূত কাঠের হস্তকুঠার পাওয়া যায়, যা বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে।[৭৭] ময়নামতিতে আনন্দ বিহার উৎখনন কালে প্রস্তরীভূত কাঠের হাতিয়ার পাওয়া যায়।[৭৮] জনাব হাবিবুল্লা পাঠান ওয়ারী বটেশ্বর এলাকায় প্রাপ্ত বেশ কিছু হাতিয়ারকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বলে দাবী করেন।[৭৯] এভাবে বহুদিন যাবৎ বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ার পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য যে, সে সকল আবিষ্কারকে অনুসরণ করে কোন

প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান হয়নি। প্রত্নতাত্ত্বিক দিলীপ কুমার চক্রবর্তী অভিমত পোষণ করেন, প্লাইস্টোসিন যুগে গঠিত বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় আদিম মানুষের বসবাস ছিল।[৮০] যুক্তি হিসেবে তিনি বলেন, বাংলাদেশের অনুরূপ ভারতের বিভিন্ন ভূখণ্ডে আদিম মানুষের ব্যবহৃত হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে। উপরোক্ত ধারণা থেকে তিনি ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী, লালমাই এলাকায় একটি প্রত্নপ্রস্তর যুগের স্তর বিন্যাস (Stratified lyer) দেখতে পান। ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে দিলীপ কুমার চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ডঃ হারুনার রশীদ, ডঃ সৈয়দ কামরুল আহসান, ডঃ মোজাম্মেল হক, ময়নামতি এলাকায় অনুসন্ধান করে ৫৪ টি প্রস্তরিভূত কাঠের হাতিয়ার আবিষ্কার করেন।[৮১] এভাবে বাংলাদেশে প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব চর্চা শুরু হয়। চক্রবর্তীর আবিষ্কারের পরবর্তীকালে ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তরের উপপরিচালক ডঃ শফিকুল আলম লালমাই ময়নামতি অঞ্চলে বিশটি ঢিবি অনুসন্ধান ও সংক্ষিপ্ত উৎখনন করে ছোট বড় প্রায় ২৪০টি প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ার উদ্ধার করেন।[৮২]

১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্নতত্ত্ব একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ইতোমধ্যে তিনজন শিক্ষক ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের বৃত্তি এবং একজন ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি–এইচ. ডি. গবেষণা শেষে বিভাগে যোগদান করেছেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান ছাড়াও প্রতি বছর বিভাগীয় ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে নতুন নতুন এলাকা অনুসন্ধানে নিয়োজিত রয়েছে।

১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ বাংলাদেশ প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তর, বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর এর সংগে যৌথভাবে সাভারে রাজা হরিশ চন্দ্রের ঢিবিতে উৎখননে অংশ নিয়েছিল। ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রাপ্তি সাপেক্ষে স্বাধীনভাবে উৎখনন করার পরিকল্পনা এই বিভাগ গ্রহণ করেছে।

তথ্যনির্দেশ

১. **Knudson, S. J.**
Culture in Retrospect Houghton Miffin Co. Boston 1978. P. 453
২. **Frank Hole and Robert F. Heizer.**
An Introduction to Pre-historic Archaeology. U. S. A 1973. P. 41
৩. **Ibid :** P. 42
৪. **Daniel, G. E. :**
One Hundred Years of Archaeology London. Duck-Worth. 1950. PP

155-156.
৫. **Chakrabarti, D. K. :**
A History of Indian Archaeology from the Begining to 1947. Delhi 1988. P. 1
৬. **Ibid.** P. 1
৭. **Ibid.** P. 44
৮. বাইবেলে বলা হয়েছে যে, মহাপ্লাবনের পর তিনজন মানব পৃথিবীর তিনদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার জন্ম দিয়েছিলেন। এই তিনজনের মধ্যে একজনের নাম ছিল 'Ham'। উইলিয়াম জোন্স প্রাচীন ভারতীয়দের এই 'Ham' এর বংশধর মনে করে।
৯. **Ibid.**
১০. **ঘোষ,অমলানন্দ**
ভারতের প্রত্নতত্ত্ব কলিকাতা, ১৯৬১ খ্রীঃ পৃ-১।
১১. **Imam, Abu.**
Sir Alexander Cunningham and the Begining of Indian Archaeology, Asiatic Press. Dacca. 1966. P. 209.
১২. **Chakrabarti. D. K.** P. 174
১৩. **Ibid.**
১৪. **Ibid.**
১৫. **Cunningham. Alexander.**
Archaeological Srvey of India, Report of A Tour in Bihar and Bengal in 1879-'80. from Patna to Sunargaon Vol. XV.
১৬. **Ibid** PP. 39-94
১৭. " PP. 95-100
১৮. " PP. 100-102
১৯. " PP. 102-104
২০. " PP. 104-117
২১. " PP. 117-120
২২. " PP. 127-131
২৩. " PP. 131-135
২৪. " PP. 135-140
২৫. " PP. 102-104
২৬. " PP. 104-116
২৭. **Iman, Abu.** PP. 123-124
২৮. **Cunningham, Alexander** P. 127
২৯. **Ibid.** P. 120
Almost everywhere in Bengal I have found the same "dog-in-the manger" conduct on the Part of the Zaminders. In the Present instance the Raja's agent repeated what I had preciously heard from the people of the sorroundig villages, that great treasure was buried in the mound. This is the general belief all over the country, but it is in Bengal alone that the owner of the land with neither dig of treasure himself nor allow anybody else to make any excavations.
৩০. **Dikshit K. N.**

Memoirs of the Archaeological Survey of India No. 55. Excavations at Paharpur. Delhi 1938 P. 141.

৩১. **Chakrabarti, Dilip, K.** P. 147

৩২. **Alam, Shamsul, A. K. M.**
Mainamati, Dacca. 1982 (2nd ed.) P. 1

৩৩. **Wheeler, R. E. M.**
Archaeology from the Earth London. 1965. P. 209
..... Unrecorded excavation in the unforgivable destruction of evidence: and the more complete and scientific the excavation, the greater the measure of destruction."

৩৪. **Haque, Enamul.**
Survey of Museums & Archaeological Education & Training in East Pakistan. Dacca. 1970. P. 69.

৩৫. **Ibid** P. 69.

৩৬. **Ibid** PP. 69-70

৩৭. **Ibid** P. 70

৩৮ **Ahmed Nazimuddin Dr.** (ed.) *Bangladesh Archaeology* Number-1. Dacca-1979

৩৯. **Ahmed, Nazimuddin.**
Mahastan Paharpur Mainamati

৪০. **Ahmed, Nazimuddin.**
Paharpur, Dacca.

৪১. **Ahmed, Nazimuddin.**
Mahastan, Dacca. 1975.

৪২. **Alam, Shamsul, A. K. M.**
Mainamati. Dacca. 1982

৪৩. আলম, শামসুল, এ. কে. এম.
লালবাগ দুর্গ ও যাদুঘর, ঢাকা

৪৪. **Qadir, M. A. A.**
Paharpur, Dacca. 1980

৪৫. **Rashid, Harunur.**
Paharpur, Dacca. 1982 (?)

৪৬. **Ali, M. and Bhattacharya, S. B.**
Archaeological Survey Report, Bogra District. Dacca 1986

৪৭. **New Archaeology**
New archaeology is a cognitive frame of reference for transforming our observations about the statics of the archaeological record into statements about its dynamics.' **Binford, L. A.** (ed) *General Introduction in for Theory Building in Archaeology* Academic Press, Newyork. 1977 PP. 6-7

৪৮. Traditional Archaeology is to reconstruct the cultural history from material culture.

৪৯. **Chakrabarti, Dilip, K.** P. 173.

৫০. **Ibid.** P. 26.
৫১. **Jami, Lutful hye.**
' The Archaeological Museums of Bangladesh Their Rise and Growth. Journal Archaeology. (ed) Malaysia. 5. 1992
৫২. **Mahmud, Firoz.; Rahman, Habibar.**
The Museums in Bangladesh. Dhaka, 1987. P. 116
৫৩. *Siddhanta, 5.*
Some Recently acquired sculpture in the Varendra Research Museuam. The Journal of the Varendra Research Museum. Vol. 3. 1874. P. 103
৫৪. **Tofayel, Z. A.**
Bangladesh Antiquitis & Museums Dacca, 1972. P. 2.
৫৫. *'A Brief Report on the Working of the Varendra Research Museum'* Journal of the Varendra Research Museum. Vol. 5. 1976-77. PP. 125-127.
৫৬. **Mahmud, Firoz, Rahman, Habibur,** PP. 292-93.
৫৭. **Habibullah, A. B. M.**
'Nalini Kanta Bhattasali,'
Nalini Kanta Bhattasali Commemoration. Vol.
Dacca museum. PP. 11-111
"He wandered through the Country side, exploring, Photographing and collecting objects, undertook excavations, gave lectures and organised exhibitions to create local interest in the preservation of antiquities."
৫৮. **Ibid** P. 111
৫৯. **Bhattasali, N. K.**
Iconography of Buddist and Brahmanical Seculptures in the Dacca Museum, Dacca. 1929.
৬০. **Haque, Enamul.**
Survey of Museums & Archaeological Education & Training in East Pakistan. Dacca. 1970. P. 61
৬১. **Ibid** P. 61
৬২. **Ibid** P. 62
৬৩. *ঢাকা যাদুঘর থেকে বাংলাদেশ 'জাতীয় যাদুঘর (১৯১৩–৮৮ খ্রীঃ)* নির্বাচিত ঘটনাপঞ্জী।'
স্মরণিকা, বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর ৭৫মে প্রতিষ্ঠাতা বার্ষিকী, ১৯১৩–১৯৮৮ খ্রীঃ।
৬৪. **Imamn, Abu.**
'Ram Raz : An Early Indian Antiquarian Nalini Kanta Bhattasali Commemoration *Vol.* Dacca. 1929. P. 74.
৬৫. **Ibid.**
৬৬. **Haque, Enamul.**
Survey of Musiums and Archaeologycal Education and Training in East Pakistan. Dacca, 1970, P-9
৬৭. **Ibid.**
৬৮. **যাকারিয়া, আ. ক. ম.**
বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ, ঢাকা, ১৯৮৪ খ্রীঃ

৬৯ *'ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরী : বিবর্তন ও সম্ভাবনা,* বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর, ১৯৮৯ পৃ ২৮
৭০. *'Binnial Report of The general Recretary for 1992-93?* The Asiatic Society of Bangladesh.
৭১. **Haque, Enamul.** *Survey* PP. 66-67.
৭২. **Chakrabarti, Dilip, K.** *Ancient Bangladesh.*
৭৩. **হক, ডঃ মুহম্মদ এনামুল**
'পূর্ব পাকিস্তানে প্রত্নতাত্ত্বিক কর্মতৎপরতা' ইতিহাস পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা ঢাকা–১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।
৭৪. **তরফদার, মমতাজুর রহমান,**
'পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্নতত্ত্ব' ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, ঢাকা ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ
৭৫. **Shamsuddin, S. Dara; Alam, M. Shamsul.**
'Deposition Environment of the palaeo-Archaeological site of the Lalmai Hills, Bangladesh; Chakraborti. Dilip : *Ancient Bangladesh.* P. 188.
৭৬. **Rashid, Harunar.**
'Bangladesh Times' 16 sept. 1979.
৭৭. **Ibid**
৭৮. **Ibid**
৭৯. **পাঠান, মহাম্মদ হাবিবুল্লাহ**
প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ঃ, উয়ারী বটেশ্বর ঢাকা, ১৯৮৯·
৮০. **Chakrabarti, Dilip. K.** P. 34
৮১. **Ibid** PP. 34-35.
৮২. **Alam, Shafiqul.**
'Fossilewood Assemblege from Lalmai mainamati Hill Range Comilla' প্রবন্ধটি চতুর্থ সার্ক প্রত্নতাত্ত্বিক সম্মেলনে (১৯৯১ ইং) পঠিত হয়েছিল।

NEOLITHIC SETTLEMENT PATTERN OF THE LOWER GANGA PLAIN.

Dr. M. M. Hoque.

The Lower Ganga Plain (excluding Bangladesh) (21° 25'-26° 50' N : 86° 30'-89° 58' E) has an area of 80,968 sq. km., extending from the foot of the Darjeeling Himalaya in the north to the Bay of Bengal in the south and from the edge of Chotanagpur high lands in the west to the boundary between Bangladesh and Assm in the east. It includes the administrative divisions of the Kishanganj tahsil of purnea district of Bihar and the whole of West Bengal except Purulia district and the mountainous part of Darjeeling district (Singh 1972 : 295-298; Spate et al. 1967 : 571-574). The region has been divided into three physiographic zones :

a. North Bengal Plain : Lies between Darjeeling Himalayan foothills and north of Murshidabad district. A number of swiftly flowing rivers like the Torsa, the Tista, the Purnabhaba, the Nagar, the Jaldhaka and the Mahananda flowing in this area. This region has been sub-dividel into two : i. duars in the north and ii. barind tract in the south.

b. Delta proper : Lies on both sides of the river Bhagirathi and the Hooghly in the districts of Murshidabad, Nadia, 24-parganas, eastern part of Burdwan and south-eastern part of Midnapur. To the east of Bhagirathi-Hooghly the area is extremely low and flat with a number of depressions which remain inundated in all seasons. Due to unequal aggradation the height is uneven, ranging from 3 m to 8 m above the mean sea level. The western part of the delta is a typical erosional flood

plain and has steeper slopy character. The sub-ragion has been further sub-divided into three : i. moribund delta, ii. mature delta and iii. active delta.

c. Rarh plain or the Western Margins of the Delta : consists of the districts of Birbhum, Bankura, and western part of Burdwan and Midnapur. The eastern part of this sub-region is broadly described as a level area not materially different from the adjoining delta proper. From the middle part to the West, ground surface rises gradually in undulating plains, the elevations becoming more pronounced towards the west where the land is interspersed with hillocks and broken up into low ridges and valleys. Its western part is a shelf of lateritic old alluvium which is known as Rarh. Several rivers like the Ajay, the Damodar, the Dwarakeswar, the Rupnarayan, the kasai, the Tarapheni and the Suvarnarekha flow through the region. The zone is further sub divided into three : i. Birbhum-Abamsol Rarh, ii. Bankura Rarh, and iii. Midnapur Rarh.

The geological formation of the region is divided into two :

1. Older alluvium of the Pleistocene, containing clay and silt, sometimes associated with pebbles and gravels, and

2. Newer alluvium which occurs mainly in the deltaic area, and is characterized by the old mud, new mud and marshes.

Climatically, the region is humid. The annual average rainfall is 1440 mm in the delta proper and the Rarh plain, and 3130 mm in the North Bengal plain, excluding hilly areas where it is more than 3130 mm. The region is rich in floral and faunal resources. The principal trees in the region are sal (Shorea robusta) mahua (Madhuca indica), palas (Butea monosperma), kusum (Scleichera oleosa) and clumps of bamboo (Dendrocalamus strictus). Of the wild fauna that still remains are tiger, leopard, wolf, hyena, jackal, fox, bear, boar, sambar, spotted deer, barking deer, ravine deer, and various species of birds, fishes and reptiles.

The discovery of implements of the early farming

community in the region can be traced back to as early as 1865 when V. Ball (1865 : 127-128) discovered a handaxe made on green quartzite in Kunkun village, 18 km south-west of Govindapur in Bankura district. Two years later he made another discovery of a Neolithic celt from the same area (Ball 1867 : 143). In the Beginning of the present century E. H. C. Walsh (1904 : 20-24) discovered a few Neolithic implements from Kalimpong in Darjeeling district. The prehistoric discoveries of the region were systematically organised by H. C. Chakladar (1941 : 208-236, 1942 : 140-162, 1952 : 124-164). From 1938 to 1941 K. G. Goswami (1948) conducted excavation at the historical site of Bangarh in Dinajpur district where he obtained a Neolithic celt from pre-Sunga level. A total of 12 Neolithic stone implements comprising celts and chisels were discovered by D. Sen (1948 : 252-253) in 1948 near Bamal village, 5 km south of Lalgarh in Jhargram subdivision of Midnapur district. Syntheses of Neolithic finds of the region were prepared by V. D. Krishnaswami (1960 : 25-64), A. H. Dani (1960) and B. K. Thapar (1965 : 87-112) in the early 1960s.

The aim of the present paper is to synthesize of the data available for Neolithic culture of the region with special reference to its settlement pattern. The data used in preparing this study have been collected from published sources like the Indian Archaeology : A Review and excavation reports. The factor affecting the present study is that information for location of sites (taluka/tahsil, geocordinates and nearest prominent locality), their size, water sources (river, nala and lake) and spacing between the sites is not fully given in the reports. Because of this reason sites are ploted on the map approximately. The data have been analysed in relation to environmental parameters.

In the Lower Ganga plain a total of 84 Neolithic sites have been located (Table I, Fig. I and I A). of these, 53 sites are found in Midnapur, 15 in Bankura, six in Darjeeling, three in Birbhum, two each in Burdwan and 24-Parganas and one each in

Howrah, Dinajpur and Murshidabad districts of West Bengal. Sites are mainly distributed in the three sub-regions-- 71 (84. 52%) in the rarh plain, 7 (8. 33%) in the north-Bengal plain and 6 (7. 14%) in the delta proper. In the rarh plain sites are found-52 (61. 90%) in the Midnapur Rarh, 15 (17. 86) in Bankura Rarh and 4 (4. 76%) in Birbhum-Asansol Rarh. In the north-Bengal plain six sites are found in the duars and one in the barind tract. In the delta proper three sites are found in the Mature delta, two in the Active delta and one in the Moriband delta. Sites are located along the river banks. Of the reported sites, the precise location of 78 is known-23 on the Suvarnarekha, 21 on the Tarapheni, 10 on the Gandheswari, six on the Tista, three each on the Damodar and Silawati, two each on the Hooghly, Dwarakeswar, Bakreswar and Kansabati and one each on the Ajay, Dulung, Rupnarayan and Purnabhava.

Except Bangarh and Tamluk none of these sites has been excavated. Bangarh is located on the left bank of Purnabhava in Dinajpur district. It was excavated from 1938 to 1941 by K. G. Goswami (1948). Excavation revaled cultural materials of Sunga, Kushana and Gupta periods. A Neolithic celt was found made on flint in the excavation below the Sunga leval.

Tamluk is situated on the right bank of Rupnarayan river in Midnapur district. The site was excavated first by M. N. Deshpande in 1954-55 (IAR 1954-55 : 19-20) and by S. K. Mukherjee in 1973-74 (IAR 1973-74 : 33). The excavation revealed four cultural periods : period I-Neolithic, period II-Chalcolithic, Period III-Early Iron Age, period IV-Late Iron Age and Gupta. The Neolithic Phase is represented by ill-fired pottery, small polished stone celts and a variety of bone implements.

Explorations in the region have yielded a large number of ground stone implements and pottery. The pottery has been found only at four sites, namely Chaidhah, Kurkutia and pareshnath in Bankura district and Laljal in Midnapur district, and is limited in quantity. Pottery from sites in Bankura district

included a few hand made coars grit-tempered sherds which were weathered. In spite of heavy weathering a few of them show some slip on both sides. The shapes include bowl with internally bevelled or featureless rim with a single groove just below the rim. Besides, a few specimens of stone ware (sand-stone) were also picked up from Kurkutia (Ghosh 1970 : 333-339).

The Ground implements comprise celt, shouldered celt, bar-celt, perforated celt, sockted celt, faceted tool, adze, splayed edged axe, chisel and ring stone. These are made of basic rock trap, siltstone, schist, epidiorite, granite, basalt, slate, quartzite, sandstone, crystalline limestone, chert, chalcedony, flint, shale and jadeite. The shapes of celts are in four categories i. e. triangular, sub-triangular, quadrangular and rectangular and having round. oblique, straight or convex cutting edges. Among other Neolithic artefacts hammerstone, elongated pick, wedge blade, polisher, pestle, quern and amulate can be mentioned (Datta 1992).

The sites can be grouped into two categories : cluster occurrence and sporadic occurrence. The former type is found in the valleys of the Suvarnarekha, Tarapheni and Gandheswari. Floods may have been a major factor in the selection of sites for settlement. Distribution of sites suggests that 82 (97. 62%) sites are licated above the flood prone zone. The maximum number (71) of sites in the rarh plain is probably guided by the easy availability of raw material for making tools and wild animals for subsistence. Alternatively, the presence of seven sites in the north-Bengal plain and six in the delta proper indicate that the regions were extensively colonised by the Neolithic people more effectively than their predecessors of the Palaeolithic and Mesolithic periods. Except for a small number of potsherds and ground stone tools no other material is found at these sites. Therefore, it is difficult to say anything about the micro-settlement and subsistence strategies.

Chronology

It is difficult to establish the dates of the Neolithic culture of the region since the archaeological material does not occur in stratified contexts. A. H. Dani (1960 : 86-87) suggested the upper limit of the Neolithic culture on the basis of the finds from the excavations at Bangarh in Dinajpur district and Tamluk in Midnapur district as third or second century B. C. But the lower limit of this culture is not agreed upon by archaeologists. M. N. Deshpande (IAR 1954-55 : 19-20) who excavated Tamluk was in favour of pushing back the lower limit of Neolithic culture beyond 2500 B. C. H. D. Sankalia (1974 : 280) classified Assam, Bihar and Bengal Neolithic as pure Neolithic culture. The age of the Bihar i. e., Middle Ganga valley, Neolithic is proposed as c. first half of the third millennium B. C. or a little earlier on the basis of C^{14} dates at Senuwar in Rohtas district (Singh 1990 : 18). The lower limit of the Lower Ganga valley Neolithic can also be assumed to be the same. According to Allchins (1989 : 119-120) the Neolithic of Bengal and Assam represents a late phase and has very definite south Chinese and southeast Asian affinities. T. C. Sharma (1981 : 41-52) has suggested 5000 B. C. for the Early phase and 2000 B. C. for the Late phase of the northeast Indian Neolithic culture. In the light of the age of the Neolithic culture of northeast India and the Middle Ganga valley, the lower limit of the Lower Ganga valley Neolithic culture can be placed somewhere in the third millennium B. C.

Fig-1

Distribution of Neolithic Sites in the Lower Ganga Plain

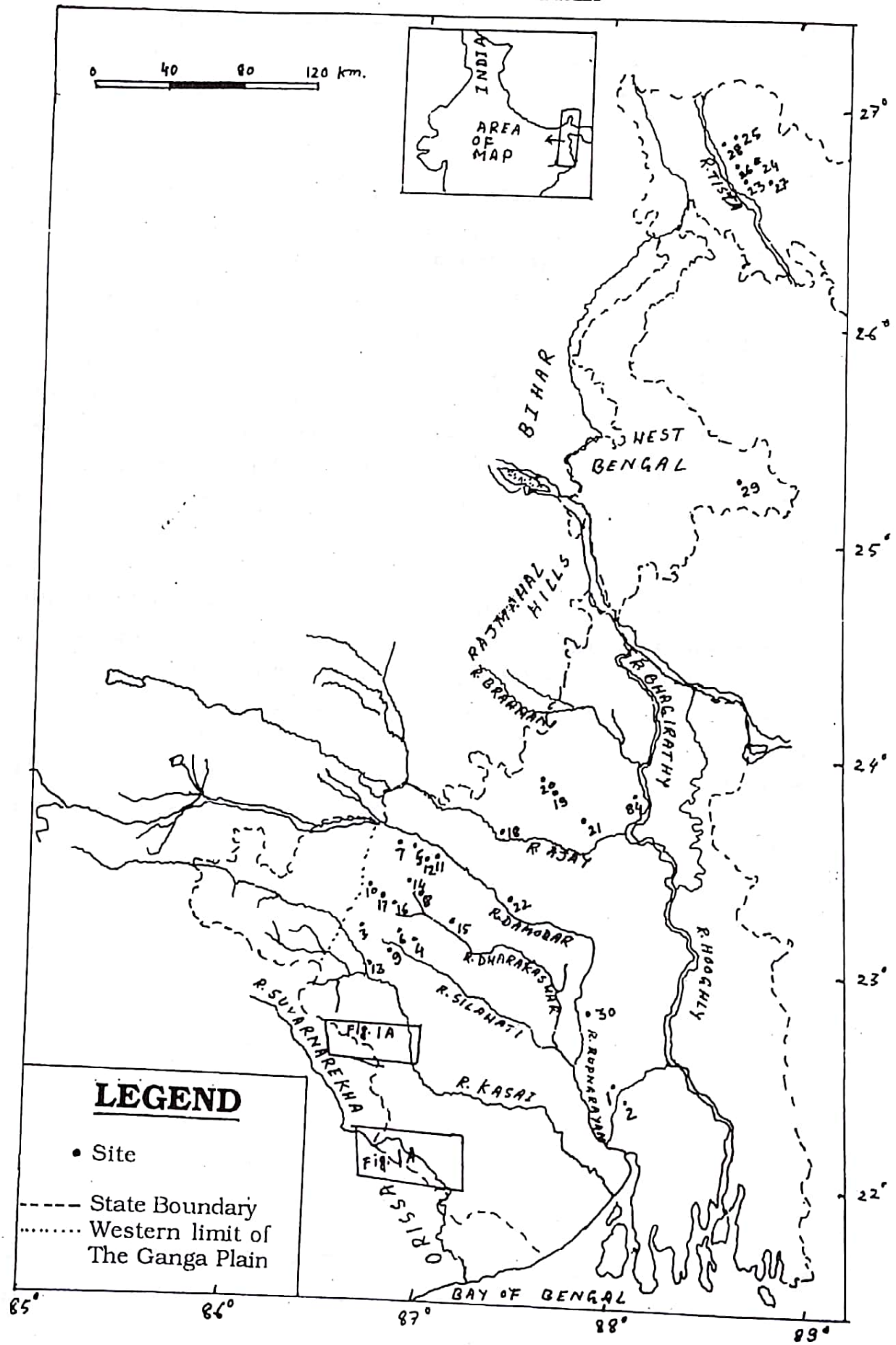

Fig-1a

Distribution of Neolithic sites in the Midnapur District

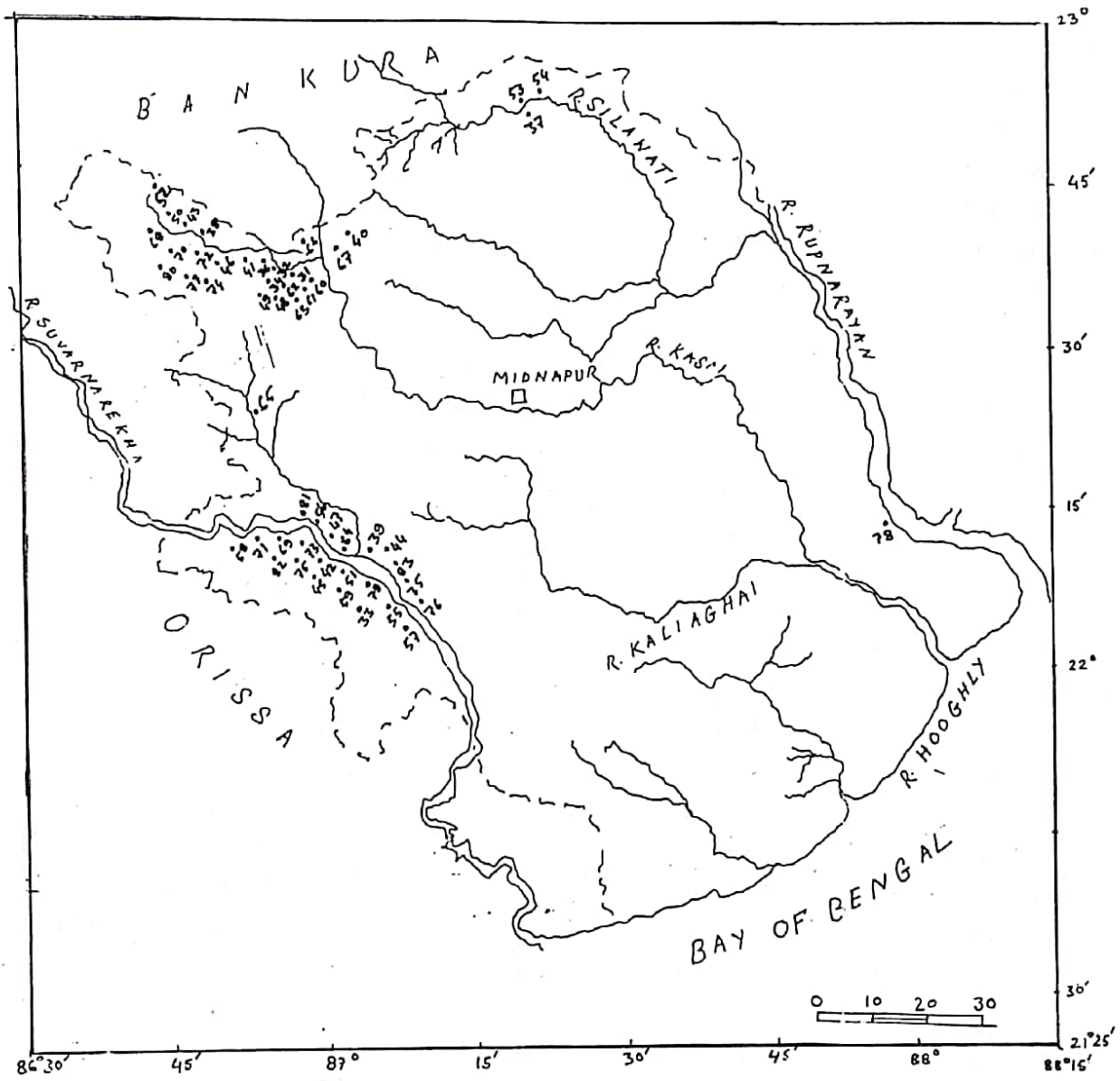

Table 1. List of Neolithic sites in the Lower Ganga Plain.

ord#	SITE	DIST	RIVER VAL REFERENCE
1	Harinarayanpur I	24-Parganas	Hooghly Chakrabarti 1967 : 98-109
2	Harinarayanpur II	24-Parganas	Hooghly Chakrabarti 1967 : 98-109
3	Bankajor	Bankura	Gandheswari Datta 1992 : 61
4	Barkola	Bankura	Gandheswari Chakrabarti 1967 : 98-109
5	Biharinath	Bankura	Damodar Datta 1992 : 61
6	Bisinda	Bankura	Gandheswari Datta 1992 : 61
7	Bon-Asuria	Bankura	Damodar Chakrabarti 1967 : 98-109
8	Chandra	Bankura	Gandheswari Datta 1992: 61
9	Chiadah	Bankura	Dwarakeswar Chakrabarti 1967 . 98-109; IAR 1957-58 : 69
10	Dhankora	Bankura	Gandheswari Datta 1992 : 61
11	Joyapanda	Bankura	Gandheswari Datta 1992 : 61
12	Kankradara	Bankura	Gandheswari Chakrabarti 1967 : 98-109
13	Kunkune	Bankura	Riverine Ball 1965 : 127-128
14	Kurkutia	Bankura	Gandheswari IAR 1959-60 : 48
15	Kusadwip	Bankura	Dwarakeswar Datta 1992 : 61
16	Pareshnath	Bankura	Gandheswari Chakrabarti 1967 : 98-109
17	Simulberia	Bankura	Gandheswari Datta 1992 : 61
18	Bhimgarh	Birbhum	Ajay Chakrabarti 1967 : 98-109
19	Jhinaipur-Kooda	Birbhum	Bakreswar IAR 1975-76 : 58
20	Potanda	Birbhum	Bakreswar IAR 1964-65 : 46
21	Jakher-Danga	Burdwan	Riverine IAR 1972-73 : 36
22	Nadiha	Burdwan	Damodar Chakrabarti 1967 : 98-109
23	Badamtam	Darjeeling	Tista IAR 1966-67 : 45
24	Dungra Basti	Darjeeling	Tista IAR 1962-63 : 43; 1975-76 :57
25	Kalimpong	Darjeeling	Tista Walsh 1904 : 20-24
26	Pedong	Darjeeling	Tista IAR 1975-76 : 57
27	Pudung	Darjeeling	Tista IAR 1975-76 : 57
28	Sindibong	Darjeeling	Tista IAR 1962-63 : 43
29	Bangarh	Dinajpur	Puranabhava Goswami 1948
30	Bagnan	Howrah	Riverine Chakrabarti 1967 : 98-109
31	Akhuldoba	Midnapur	Tarapheni Datta 1992 : 59
32	Amjharna	Midnapur	Tarapheni Datta 1992 : 59
33	Amjur	Midnapur	Suvarnarekha Datta 1992 : 57

34	Asri	Midnapur	Tarapheni	Datta 1992 : 59
35	Asurgarh	Midnapur	Suvarnarekha	Datta 1992 : 57
36	Bagdoba	Midnapur	Tarapheni	Datta 1992 : 59
37	Bagridihi	Midnapur	Silawati	IAR 1962-63 : 43
38	Baishnabpur	Midnapur	Tarapheni	Bhattacharya 1983 : 103-107
39	Bakra	Midnapur	Suvarnarekha	Datta 1992 : 57
40	Bamal	Midnapur	Kangsabati	Sen 1948 : 252-253
41	Bamundiha	Midnapur	Tarapheni	Bhattacharya 1983 : 103-107
42	Basudebpur	Midnapur	Suvarnarekha	Datta 1992 : 57
43	Belpahari	Midnapur	Tarapheni	IAR 1961-62 : 59
44	Bhedua	Midnapur	Suvarnarekha	Datta 1992 : 57
45	Bheduahuri	Midnapur	Suvarnarekha	Datta 1992 : 57
46	Bhulabheda	Midnapur	Tarapheni	Datta 1992 : 57
47	Bindan	Midnapur	Suvarnarekha	Datta 1992 : 57
48	Chirudanga	Mindapur	Riverine	Chakrabarti 1967 : 98-109
49	Deulbarh	Midnapur	Riverine	IAR 1955-56 : 69
50	Dhuliapur	Midnapur	Tarapheni	Datta 1992 : 59
51	Dudhia	Midnapur	Suvarnarekha	Datta 1992 : 57
52	Dumurgonda	Midnapur	Tarapheni	IAR 1975-76 : 58
53	Ganganir Math	Midnapur	Silawati	IAR 1964-65 : 46
54	Garbeta	Midnapur	Silawati	Chakrabarti 1967 : 98-109
55	Gelakatia	Midnapur	Suvarnarekha	Datta 1992 : 57
56	Ghorapincha	Midnapur	Suvarnarekha	Datta 1992 : 57
57	Gopalpur	Midnapur	Suvarnarekha	Datta 1992 : 57
58	Hatibari	Midnapur	Suvarnarekha	Datta 1992 : 57
59	Kalyasal	Midnapur	Suvarnarekha	Datta 1992 : 57
60	Kankrajhor	Midnapur	Tarapheni	IAR 1983-84 : 94
61	Kattara 1	Midnapur	Tarapheni	Datta 1992 : 58
62	Kattara 11	Midnapur	Tarapheni	Datta 1992 : 59
63	Kechanda	Midnapur	Tarapheni	IAR 1964-65 : 94
64	Kendugeria	Midnapur	Suvarnarekha	Datta 1992 : 57
65	Khunkrakhopi	Midnapur	Dulung	Chakrabarti 1967 : 98-109; IAR 1961-1962 : 59
66	Kolegaon	Midnapur	Tarapheni	Datta 1992 : 59
67	Lalgarh	Midnapur	Kansabati	Chakrabarti 1967 : 98-109
68	Laljal	Midnapur	Tarapheni	Datta 1992 : 59
69	Muransole	Midnapur	Suvarnarekha	Chakrabarti 1967 : 98-109
70	Organda	Midnapur	Tarapheni	Chakrabarti 1967 : 98-109; IAR

				1961-62 : 59
71	Pairakuli	Midnapur	Suvarnarekha	Datta 1992 : 57
72	Palasdanga	Midnapur	Tarapheni	Datta 1992 : 59
73	Pandapata	Midnapur	Suvarnarekha	Datta 1992 : 57
74	Rajdaha	Midnapur	Tarapheni	Datta 1992 : 59
75	Rangamatia	Midnapur	Suvarnarekha	Datta 1992 : 57
76	Sondhapara	Midnapur	Suvarnarekha	Chakrabarti 1967 : 98-109
77	Srinathpur	Midnapur	Tarapheni	Datta 1992 : 59
78	Suvarnarekha	Midnapur	Suvarnarekha	Datta 1992 : 57
79	Tamluk	Midnapur	Rupnarayan	IAR 1954-55 : 19; 1973-74 : 33
80	Tarapheni River Bed	Midnapur	Tarapheni	Chakrabarti 1967 : 98-109
81	Thakuranpahari	Midnapur	Suvarnarekha	Chakrabarti 1967 : 98-109
82	Tikayetpur	Midnapur	Suvarnarekha	Datta 1992 : 57
83	Tilakmati	Midnapur	Suvarnarekha	Datta 1992 : 57
84	Gitagram	Murshidabad	Riverine	IAR 1975-76 : 57

References

Allchin, B. and F. R. Allchin. 1989. The Rise of Civilization in India and Pakistan. New Delhi : Selectbook Service Syndicate.

Ball, V. 1865. On Stone Implements Found in Bengal. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal 127-128.

1867. Note on Stone Implements Found in Bengal. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal 143.

Bhattacharya, M. 1983. On the Recent Findings of Ground and Polished Stone Industries of South West Bengal, in Sir Dinesacandrika *Studies in Indology*, D. C. Sircar Felicitation Volume (B. N. Mukherjee, D. R. Das, S. S. Biswas and S. P. Singh Eds.), PP. 103-108, Delhi : Agam Kala Prakashan.

Chakladar, H. C. 1941. The Prehistoric Culture of Bengal, *Man in India* 21 : 208-236.

1942. The Prehistoric Culture of Bengal, Man in India 22 : 140-162.

1952. The Prehistoric Culture of Bengal, Man in India 31 : 124-164.

Chakrabarti, M. 1967. Occurrence of Neolithic Implements in West Bengal, Bulletin of the Cultural Research Institute, Government of West Bengal 6 (1-2) : 98-109.

Dani, A. H. 1960. Prehistory and protohistory of Eastern India. Calcutta : Firma K. L. Mukhopadhyay.

Datta, A. 1992. Neolithic Culture in West Bengal. Delhi : Agam Kala

Prakashan.
Ghosh, N. C. 1970. On the Neolithic pottery of Eastern India. Journal of the Oriental Institute 19 : 333-339.
Goswami, K. G. 1948. Excavations at Bangarh (1938-41). University of Calcutta.
IAR : Indian Archaeology : A Review. Annual Publication of the Archaeological Survey of India.
Krishnaswami, V. D. 1960. The Neolithic Pattern In India. Ancient India 16 : 25-64.
Sankalia, H. D. 1974. The Prehistory and Protohistory of India and Pakistan. Poona : Deccan College post-Graduate and Research Institute.
Sen, D. 1948. A Note on Stone Celts and Chisels from West Bengal. Science and Culture 14 (6) : 252-253.
Sharma, T. C. 1981. The Neolithic Pattern of North Eastern India. in Maduhu : Recent Research in Indian Archaeology and Art History, Sri M. N. Deshpande Festschrift (M. S. Nagaraja Rao Ed.), PP. 41-52, Delhi : Agam Kala Prakashan.
Singh, B. P. 1990 Early Farming Communities of Kaimur For-Hills. Puratattva 19; 6-18.
Singh, R. L. 1972. India : A Regional Geography. Varanasi : National Geographical society of India.
Spate, O. H. K., A. T. A. Learmonth and B. H. Farmer. 1967. India, Pakistan and Celon : The Regions. London : Methuen and Co. Ltd.
Thapar, B. K. 1965. Neolithic problem In India. in Indian Prehistory : 1964 (V. N. Misra and M. S. Mate Eds.), PP. 87-112, poona : Deccan College post-Graduate and Research Institute.
Walsh, E. H. C. 1904. A Note on the Stone Implements in the Darjeeling District. Journal of the Asiatic Society of Bengal 73 (3) : 20-24.

সম্প্রতি সংগৃহীত পোড়ামাটি বিষ্ণু ঃ বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন

ড. আফরোজ আকমাম

বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর সম্প্রতি একটি পোড়ামাটির বিষ্ণুমূর্তি সংগ্রহ করেছে। সংগ্রহ নং ই–৯৪· ২৩৮৫ উঃ ৬৮ সেঃমিঃ প্রস্থ ৩০ সেঃমিঃ। এ ধরনের ভাস্কর্য জাতীয় যাদুঘরের ইতিপূর্বে সংগৃহীত হয়নি। বাংলাদেশের অন্যকোন যাদুঘরেও তা সংগৃহীত আছে বলে জানা নাই। বগুড়া শহর থেকে ৬/৭ মাইল উত্তর পশ্চিমে রাজাকপুর গ্রামের সংগ্রাইল বিলের পাড় থেকে মূর্তিটি সংগৃহীত হয়। এই গ্রামে বেশ কিছু উঁচু ঢিবি রয়েছে, যেগুলিতে মোটামুটিভাবে ইটের গাঁথুনি পরিলক্ষিত হয়। তবে কালের পরিক্রমায় এগুলির উপর ক্রমশ ঘাস, আগাছা ও বড় বড় গাছ, বাঁশের ঝাড় গজিয়ে উঠে জঙ্গল বা উঁচু ঢিবিতে পরিনত হয়েছে। এগুলি যে এক সময় জনাকীর্ণ ছিল তা সহজে বুঝবার উপায় নেই। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত 'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে রিপোর্ট–বগুড়া'[১] তে নুনগোলা ইউনিয়নস্থ রাজাপুরে তিনটি ঢিবি সনাক্ত করা হয়েছে। ১. ধান ভানদার ঢিবি ২· চাঁদের বাড়ী ঢিবি ৩. ধাপ। ধানভানদার ঢিবিটি সংগ্রাইল বিলের নিকটে অবস্থিত। তাতে মনে করা যেতে পারে এই ঢিবিরই কোন মন্দিরে হয়ত এই মূর্তিটি এক সময় পূজিত হত। কালো রঙের এই পোড়ামাটির ভাস্কর্যটি প্রায় আটটি খন্ডে খন্ডিত। মস্তক ঘাড় থেকে বিচ্ছিন্ন, ডান হাত তিন খন্ডে খন্ডিত। গদাদেবী বিষ্ণুর মূল হাত থেকে বিচ্ছিন্ন। বাম হাত সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। কেবলমাত্র বামপার্শ্বে চক্রপুরুষের মাথায় বিষ্ণুর হাতের ভগ্নাংশ স্থাপিত। এছাড়া মূল মূর্তিটি আয়তকার পেডেস্টাইল থেকেও বিচ্ছিন্ন। তবে এর কিছু কিছু অংশ অপর অংশ থেকে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন যা জুড়ে দিলে মোটামুটিভাবে বিষ্ণু মূর্তিটিকে দাঁড় করান যাবে। (প্লেট– ১ দ্রঃ)। ভাস্কর্যটি সম্পূর্ণ করে দাঁড় করালে দেখা যাবে ডান পাশের উপরের হাতটি সম্ভবত বরদা মূদ্রায় এবং নিচের হাতটি একটি নারী মূর্তির মাথা স্পর্শ করে আছে। সম্ভবত এটি গাদা দেবী। বামের স্বাভাবিক হাতটি বিলুপ্ত, নিচের হাত শঙ্খ পুরুষের মাথায় ছোঁয়ান। বিষ্ণুমূর্তি ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিঁতে দন্ডয়মান। মূর্তির অলংকৃত কীরিটের সামনের অংশে চক্রাকার হ্যালোর উপর কৃতিমুখ খচিত। কানে কুন্ডল রয়েছে, মূল মূর্তিটি

কিছুটা পেশী বহুল ও অলংকার বিহীন। গলায় যজ্ঞোপবীত। পরনে অত্যন্ত সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত বস্ত্র যা চক্র পুরুষের পরনেও লক্ষণীয়। ভাস্কর্যটি সামনে ও পিছনে পরীক্ষা করে দেখা যায় একটি বস্ত্রখন্ড কোমড়ে শক্ত করে গিঁঠ দেয়া হয়েছে। এবং নিচের ঝুলান অংশটি নিয়ে পিছনে গোঁজা হয়েছে। মূল মূর্তির ডানদিকে দন্ডায়মান গদাদেবী ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে করজোরে রয়েছে, তার বসন পা ছুঁয়েছে এবং উত্তরীয় বিদ্যামান। কোমরে বিছা, হাতে চুড়ি,গলায় মালা রয়েছে। চক্রপুরুষ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে, স্বল্প বস্ত্র, হস্তযুগল পরস্পর বন্ধনে আবদ্ধ রেখে অত্যন্ত আয়েশে দন্ডায়মান। চক্রপুরুষ ও গদাদেবী উভয়ই মূল মূর্তির ন্যায় পাদপীঠ থেকে বিচ্ছিন্ন। মূল মূর্তির শরীরের অলংকারহীনতা ও অত্যল্প বস্ত্র, নিম্নদিকে প্রলম্বিত হস্ত, পাদপীঠ চক্রপুরুষ ও গদাদেবীর উপস্থিতি শরীরে কিছুটা ভারী দৃঢ় ও স্থূলগড়ন যুপ্তযুগের প্রথম ভাগের মূর্তি বলে প্রমান করে। অপর দিকে ভাস্কর্যটির মুখের আদল, মসৃন, মার্জিত, রমনীয়- ডৌল, শান্ত সৌম্য, ধ্যান- গম্ভীর দৃষ্টি ও চক্রযুক্ত হ্যালো সম্মিলিত কিরীট ৫ম ৬ষ্ঠ শতাব্দীর গুপ্তযুগীয় শিল্প রীতির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ।

সম্প্রতি রাজাকপুরে একটি পুকুর থেকে সংগ্রহ ভ্রমণে আরেকটি বিষ্ণু-এর ভগ্নাংশ সংগ্রহ করে আনা হয়। সংগ্রহ নং ই- ৯৪·৫৪৮, উঃ ৩৮ সেঃ মিঃ প্রস্থ ১৫ সেঃ মিঃ। ভাস্কর্যটির হাঁটুর উর্দ্ধভাগ থেকে বক্ষের উর্দ্ধভাগ পর্যন্ত বিদ্যমান। সংগ্রহকারীর সাথে আলাপে জানা যায়, প্রায় চার বছর আগে তারা নিদর্শনটি বিলের পাড় থেকে সংগ্রহ করে সযত্নে সেটা বাড়ীতে সংরক্ষণ করছিলেন। এই মূর্তিটিও কিছুটা ছাই রঙোর; স্বভাবিক পোড়ামাটি রঙের নয়। সম্ভবত ভাস্কর্যটি তৈরী করার সময় শিল্পী বিশেষভাবে নির্দেশিত হয়ে অথবা রাজমহল থেকে আনীত কালো কষ্টি পাথরের আদল আনার জন্য এই কালো রং ব্যবহার করেন। এখানে লক্ষণীয় কীচক, বগুড়া থেকে প্রাপ্ত জাতীয় যাদুঘরের সংগৃহীত পোড়ামাটি বিষ্ণুমূর্তিটিও কিছুটা বাদামী/ছাই রঙের। এখানে দু'টি বিষয় লক্ষনীয়, মহাস্থান থেকে সংগৃহীত অসংখ্য পোড়ামাটি নিদর্শনের যে লাল মাটির রং রয়েছে বড় আকারের বিষ্ণু-এর ক্ষেত্রে তা লক্ষণীয় নয়। তাতেই প্রমানিত হয় পাথরের স্বল্পতাহেতু পাথরের অনুকরণ করে এই পোড়ামাটির মূর্তিগুলি তৈরী করতে যেয়ে বা অধিকতর মজবুত করার জন্য হয়ত বিশেষ ধরণের মাটি ব্যবহার করেছে। এখানে একটি কথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, রজাকপুরের এই ঢিবিগুলি সম্ভবত বৈষ্ণব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। এই প্রসংগে বলা যায় মহাস্থান গড়ের পলাশবাড়ী ও সরলপুর থেকে জাতীয় যাদুঘরে প্রায় ৫৩ টি পোড়ামাটি ফলক সংগৃহীত হয়। যেগুলি রামায়ণ— কাহিনী সম্বলিত[২] এগুলির অপর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ফলকের গায়ে সপ্তম শতাব্দীর লিপিতে পরিচিতিমূলক চিহ্ন রয়েছে। এই সংগ্রহের একটি ফলকে (সংগ্রহ নং ই- ৮৪·১৪৪) লেখা রয়েছে 'সীতা'। যদিও লেখা কিছুটা অস্পষ্ট এবং সেখানে যে দৃশ্য উৎকীর্ণ করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে

একজন রমনী মন্দিরে প্রবেশরত (প্লেট– ২১)। এতে বোঝা যায় রমনীটিই সীতা। মন্দিরের ললাট বিম্বে দুই পার্শ্বে দু'টি শঙ্খ ও মধ্যখানে একটি চক্র রয়েছে। যা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে এটি একটি বৈষ্ণব মন্দির। কাজেই এটি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, গুপ্ত শাসন আমলের প্রথম থেকেই পুন্ড্রনগরে বৈষ্ণব মন্দির নির্মাণ কিংবা বিষ্ণুমূর্তি তৈরীর মধ্য দিয়ে বৈষ্ণব ধর্ম জনপ্রিয় করার জন্য একটি প্রয়াস চলতে থাকে। লিপিমালা বিচারেও দেখা যায় বঙ্গে প্রাপ্ত ধনাইদহ তাম্র শাসন (৪৩৩খ্রীঃ) থেকে শুরু করে গুনাইঘর (৫০৮ শতাব্দ) তাম্রশাসন পর্যন্ত সমস্ততেই বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসারের এক ব্যাপক প্রচেষ্টা চলছিল।[৩] তাম্র শাসন গুলিতে বলা আছে কিভাবে চাষযোগ্য জমি ক্রয় করে ব্রাহ্মনদের বাসস্থান, বৈদিক চর্চা কেন্দ্র অথবা মন্দির তৈরীর জন্য দেওয়া হচ্ছে। যদিও আজ একটি মন্দিরও তার অতীত গৌরবের ধ্বজা উড়িয়ে দাঁড়িয়ে নেই, তথাপি এই সব ধ্বংসাবশেষের মধ্যে থেকে এইরূপ বিচ্ছিন্ন আবিষ্কার নিঃসন্দেহে অতীত ইতহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত বহন করে।

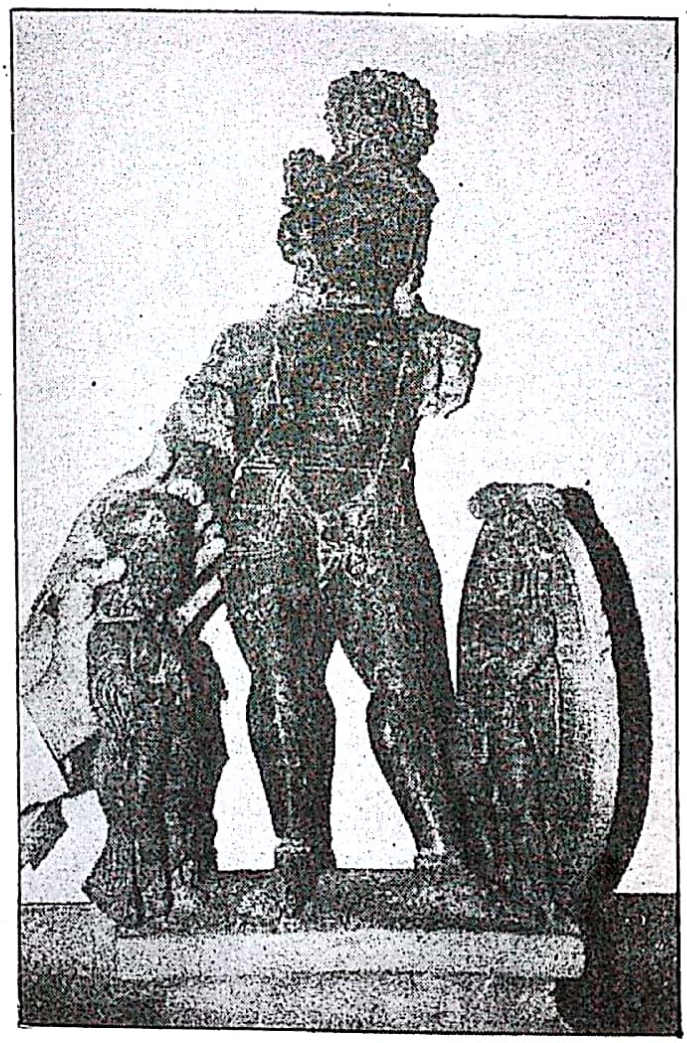

প্লেট–১

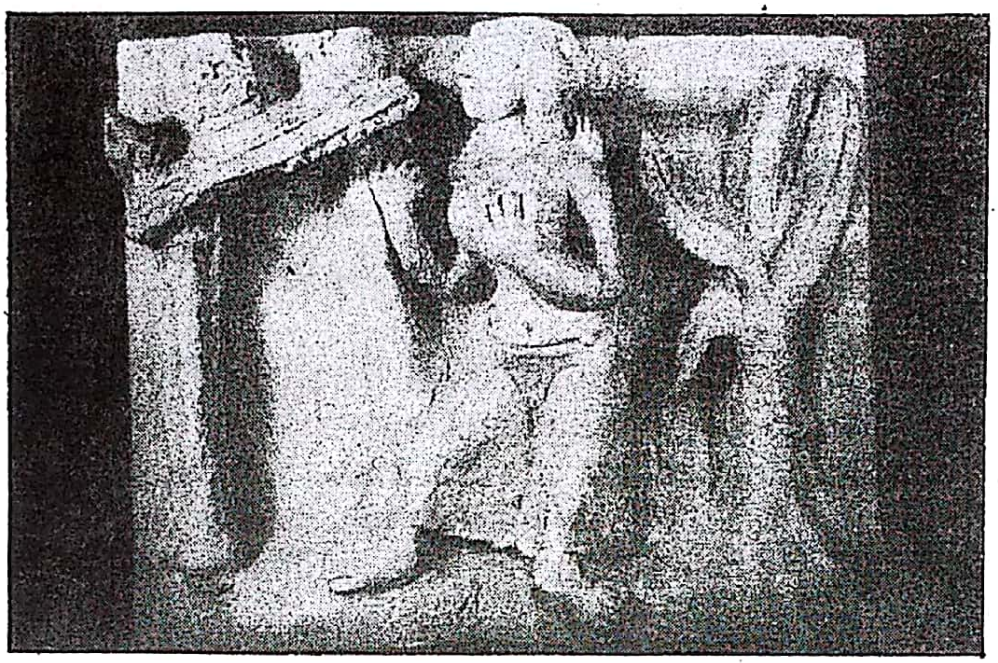

প্লেট–২

Note :

১. **Ali Mohammad & other,** *Archaeological Survey Report* (Bogra District), 1986, PP. 30 ff.

২. **Akmam Afroz,** *"A Few Inscribed Terracotta plaques Depicting Scenes From The Ramayana Recently Discovered In Bangladesh".* PP. 383 ff.

Datta Asok (ed), *Studies in Archaeology*, New Delhi 1991.

৩. **Akmam Afroz,** *"Early Urban Centres in Bangladesh"* (unpublished, Ph. D. thesis), Calcutta University, 1991, P. 714.

Ai Khanum : a Greek city in Afghanistan

Dr. Olivier Guillaume

Ai Khanum (in Turkish "Moon Lady") is the modern name of a site in northern Afghanistan where from 1964 till 1978 excavations conducted by a French team led by Prof. Paul Bernard, unearthed the remains of a huge Greek city, which was once the flourishing capital of the so-called Graeco-Bactrian kingdom.

As is well known, the conquest of the Persian empire by Alexander the Great had far reaching consequences which led to the establishment of Greek kingdoms from the 3rd to the 1st c. BC over parts of Central Asia and the Indian subcontinent. This was indeed the first time that the Greek and the Indian worlds came into direct contact.

The city of Ai Khanum was probably founded by Alexander the Great himself. It remained for a few decades under the control of his immediate successors in the East, the Seleucid kings of Syria, until a local governor, a Greek named Diodotus, declared his independence around 250 BC, thus founding the Graeco-Bactrian kingdom.

First limited to Bactria proper (the ancient name of the region along the middle course of the Amu Daria), this kingdom, under the successors of Diodotus expanded northwards and southwards. To the north, it engulfed parts of the present Republics of Tadjikistan, Uzbekistan, and Turkmenistan. To the south under kings Menander and Apollodotus, it extended over the southern part of Afghanistan

and the north of Pakistan.

Around 145 BC nomads coming from the North invaded Bactria which put an end to the reign of king Eucratides, and they looked the city of Ai khanum, wiping of it one and half century of existence.

After losing their terriories north of the Hindu Kush, the Greeks continued to rule over the southern part of present- day Afghanistan and the northern part of Pakistan till the beginning of the Christian era. It is from then on that they are known as the Indo-Greeks.

The City of Ai Khanum was conveniently situated at the junction of the Amu Daria and its tributary, the Kokcha, in a vast and fertile plain of loess, inhabited and artificially, irrigated long before the arrival of the Greeks (let us not forget that the excavated site of Shortugai, the northernmost outpost of the Indus civilisation, is not far from Ai Khanum). Moreover, close to the city was the mountainous area of Badakhshan,rich in minerals and all kinds of semi-precious stones, and especially famous for its lapis-lazuli, of which it was the only source of supply during Antiquity.

Protected by the rivers on its western and southern flanks, the site was bordered to the East by a natural platform raised about 60 meters above the level of the plain. On the open northern side, the Greeks built a massive rampart of mud bricks with towers measurig more than twelve meters.

The eastern platform, or acropolis ("upper town" in Greek) was scantily built, all the major buildings being situated in the lower part of the town where fourteen years of excavations revealed a huge palatial complex, a Greek gymnasium, a Greek theatre, a temple, two mausoleums, and a residential quarter with rich houses.

Though the Greeks in Ai Khanum uses the local building material-mud bricks (only columns were in stone)-they retained their taste for their native architectural decoration. Indeed, columns of the three different Greek orders (Doric, Ionic,

Corinthian), tiled roofs edged with terracotta antefixes, bathroom floors paved with mosaics embellised the city, giving it a genuine Greek air.

As for the buildings, some were typically Greek. A good example was the theatre, carved in a semi-circular shape on the slope of the acropolis, which could accomodate about 6000 spectators on its 35 mud brick tiers, and in which the Greek repertoire was performed as proved by the discovery of a stone fountain gargoyle representing a comic mask like those worn by the Greek actors.

Greek also was the concept of the gymnasium, a 100 meters long squire building, housing the academic and athletic facilities of the city and dedicated, as was customary in Greece, to the gods heracles and Hermes.

Some buildings, such as the palace, the main temple and the house partook more of the local Iranian tradition. The place reminds us of those of the Achaemenid kings of Persia. It served three functions, being an administrative quarter, a residence and a treasury at the same time. Spread over an area of 350 x 250 meters, its entrance was through an imposing courtyard surrounded by a portico of 118 slender corinthian columns.

While traditional Greek houses were designed around a central courtyard, those of Ai khanum had a front courtyard, which was probably an influence from the local custom.

As for the main temple of the city, a 20 m long square building raised above a three-step platform, it portrayed no similarity with any Greek model. However, the discovery of a fragment of a foot in stone pertaining to a colossal statue enabled archaeologists to identify it as a representation of the Greek God, Zeus. But while the colonists performed Greek cults, the local population Probably kept their own catts as shown by the discorery of a few terracotta and ivory statuettes of mother goddesses.

The burial practices were Greek. The tombs were put outside the city walls except those of great benefactors. Such is the case of a certain Kings, probably one of the foundig fathers of Ai Khanum, who is buried in a mausoleum near the palace. A fragmentary inscription recovered from this mausoleum reads: "In childhood learn good manners; in youth learn to control your passions; in old age learn to be of wide counsel; die without regret". These belong to a series of 150 maxims engraved in the Apollo's sanctuary of Delphi in Greece and famous for embodying the Greek ideals of life, which the remote colonists of Ai Khanum seemed eager to preserve.

The language used in Ai Khanum was Greek as proved by the few inscriptions recovered. A remarkable discovery is a fragment of papyrus of a philosophical treatise of the Aristotelian school. some inscriptions mention local Iranian names, but these are always those of second-ranking officers, which gives an idea of the hierarchichal organisation in that colonial city.

A few statues, unmistakably Greek in appearance and workmanship, have been unearthed such as the bust of an old man, and that of a young naked man.

For their monumental statues or bad-reliefs however, the craftsmen resorted to a technique which was soon to become widespread in that part of the world, namely modeling in clay or stucco around an armature of wood or lead rods.

Minor arts were well represented and numerous fragments of artifacts in terracotta, metal, bone, ivory, semi-precious stone, shell, mother of pearl have been uncovered, especially in the treasury of the palace.

One of the most striking piece is a large medallion of gilt silver showing Cubele, the Greek goddess of nature, in a chariot drawn by lions and driven by another Greek figure, a winged victory.Two priests are attending the scene. the sky is represented by the Greek Sun God Helios, the moon and a star.

Apart from raw material like semi-precious stone and shell which might have come from India, the excavations of Ai Khanum have also revealed a few objects which are most probably of Indian origin. Such is,for instance, a female figurine in bone with articulated arms. But the masterpiece is a round medallion (20 m in diameter) made of assembled small shell plaques in which bits of stained glass were inlaid, A frieze runs round the edge of the disc showing flowery branches alternating with animals (peacock and deer), buildings and some human figures,the main scene, occupying the Central part of the disc, apparently depicts a retinue of riders escorting the prcession of an important figure in a park. In fact the remains of two groups of individuals underneath parasols can be made out. This scene is probably an episode of the legend of Sakuntala (in the hermitage).Dating from the second quarter of the 2nd c. BC, it is a beautiful piece of art of the Sunga dynsty.

Of Indian origin also are the 677 punch-marked coins which were hoarded in the treasury of the place and 6 silver coins (drachms) with legend in Greek and Brahmi (of king Agathocles) representing on obverse Balaram with he plough, on the reverse krishna- Vasudeva with wheel (cakra) and conch (shanks). Dating from 180-170 c. BC these are definitely among the oldest depictions of Indian deities we have and as such constitute noteworthy evidence about the first from of Vishnuism.

The excavtion in Ai Khanum has shown that the Greeks had preserved their own culture in that remote colonial city but that they also absorbed the local tradition to create and original culture whose influence was to last for a few centuries after their fall and manifest itself, for instance, into the famous Gandhara school of art.

সুলতানি বাংলার শিলালিপি ঃ বৈশিষ্ট্য ও ভূমিকা

ড. এ. কে. এম. শাহনাওয়াজ

মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস চর্চা এবং ইতিহাস পুণর্গঠনে প্রাথমিক সূত্র হিসেবে শিলালিপির বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে। বাংলার সুলতানদের সময়ে উৎকীর্ণ শিলালিপি সমূহের উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। কিছু রয়েছে সংশ্লিষ্ট স্থাপত্যের গায়ে। আরবী ও ফার্সী ভাষায় উৎকীর্ণ এই সমস্ত শিলালিপিতে সাধারণত কুরআনের আয়াত, হাদিস, সুলতানের পরিচয়, উৎকীর্ণকারী কর্মকর্তার পরিচয় এবং তারিখ উল্লিখিত থাকতো। শিলালিপিসমূহের সিংহভাগই মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ, প্রাসাদ, সেতু, ঈদগাহ, ফটক, পুকুর এবং কুয়ো ইত্যাদি নির্মাণ বা খননের সময় উৎকীর্ণ হতো। ফলে সমকালীন মুসলিম সমাজ সম্পর্কে একটি ধারণা লাভের সুযোগ এ থেকে পাওয়া সম্ভব। সুতরাং সুলতানী বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে শিলালিপি যথেষ্ট সম্ভাবনার ইংগিত বহন করে। কারণ প্রাথমিক লিখিত সূত্রের অপর্যাপ্ততা যেখানে প্রকট সেখানে কোন ঐতিহাসিক সত্য নিরূপনে শিলালিপির স্বাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

ডঃ আহমদ হাসান দানী ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম বাংলায় বিভিন্ন সময়ে উৎকীর্ণ শিলালিপিসমূহের একটি বিস্তারিত তালিকা প্রকাশ করেন। 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তানে'র জার্নালের দ্বিতীয় খন্ডে। ১৯৬০ সালে বরেন্দ্র গবেষণা যাদুঘর রাজশাহী থেকে প্রকাশিত শামসুদ্দীন আহমদ প্রণীত (Inscriptions of Bengal Vol-IV) গ্রন্থে প্রাপ্ত শিলালিপিসমূহের পাঠ ও বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করেন। এই গ্রন্থ দু'টি সুলতানী বাঙলার শিলালিপি সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা দেয়। পরবর্তীকালে বিচ্ছিন্নভাবে আমরা আরও কিছু শিলালিপির সন্ধান পাই এবং কোন কোন শিলালিপির নতুন পঠন সম্পর্কে অবহিত হই। এক্ষেত্রে ডঃ আব্দুল করিম প্রণীত এবং এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত 'Corpus of Arabic and Persian Inscriptions of

Bengal' গ্রন্থখানি একটি মূল্যবান সংযোজন বলে আমাদের বিশ্বাস। সামগ্রিকভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বাংলাদেশে উৎকীর্ণ সুলতানী যুগের শিলালিপিসমূহের বৈশিষ্ট্য, লিখন পদ্ধতি, বক্তব্য প্রকাশের প্রবণতা, শিলালিপি উৎকীর্ণের স্থানসমূহ ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস অন্বেষণে এর ভূমিকা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা পাওয়া সম্ভব।

বাংলার সুলতানদের অধিকাংশ শিলালিপিই আরবী ভাষায় উৎকীর্ণ করা হয়েছে।[১] পদ্ধতিগত দিক থেকে শিলালিপি অংকনে অভিনবত্ব রয়েছে। মুসলিম ক্যালিগ্রাফি (Calligraphy) বা সুন্দর হস্তলিপির উদ্ভাবন এই রীতিকে বিশেষত্ব দান করেছে। ইসলাম ধর্মে প্রাণীদেহ অংকনে নিষেধাজ্ঞা থাকায় লিপি ও নক্‌শা অলংকরণের দিকে শিল্পীগণ মনযোগী হয়েছিলেন। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) নিজে লিপিকরদের সুন্দর হস্তাক্ষর পরিস্ফুটনের জন্য উৎসাহ দিয়েছেন।[২] আরবী বর্ণমালার উদ্ভব 'নাবাতীয়' বর্ণমালা হতে। উত্তর আরবে নাবাতীয় সাম্রাজ্যের অবস্থিতি ছিল। নাবাতীয়গণ আরবী ভাষায় ভাব প্রকাশ করলেও প্রথম দিকে নিজস্ব লিপি ছিল না। তারা প্রতিবেশী এ্যারামীয়দের অনুসরণে গোলাকৃতি রীতির লিপি ব্যবহার করতো। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে এই রীতি থেকেই 'নাবাতীয়' লিখন পদ্ধতির উদ্ভব হয়। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শুরুতে নাবাতীয় বর্ণমালা থেকে আধুনিক আরবী বর্ণমালার বিকাশ ঘটে।[৩] সময়ের পরিক্রমায় আরবী লিখন পদ্ধতিতে অনেক পরিবর্তন আসে। উমাইয়া শাসনের পূর্ব পর্যন্ত লিপির ক্রমবিকাশের প্রথম পর্যায় হিসেবে ধরা হয়। উমাইয়া শাসন আমল ছিল আরবী ভাষা বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়, আর তৃতীয় পর্যায় হিসেবে নির্ধারণ করা হয় আব্বাসীয় আমলকে।

প্রাক-ইসলামী যুগে আরবী বর্ণমালা এবং হস্তলিখন পদ্ধতিকে বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে দু'টি ধারায় বিভক্ত করা যায়, যেমন ১. কৌণিক ও ২. গোলাকৃতি[৪] — এই দুই রীতির মধ্য দিয়েই বিভিন্ন পদ্ধতির লিপির বিকাশ ঘটে। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের বিভিন্ন লিখন পদ্ধতির মূল ধরণগুলো নিম্নে উল্লিখিত হলো ঃ

ক. কুফিক ঃ প্রাচীন মুসলিম শহর কুফায় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে এই পদ্ধতির প্রথম উদ্ভব হয় বলে কুফিক নামে এর পরিচিতি। কুফিক পদ্ধতি কৌণিক রীতির ধারক। এই রীতির অক্ষরগুলো উলম্ব ও লম্ব দন্ডাকৃতিতে বিন্যস্ত হয়ে কোণের সৃষ্টি করে। সে সময় প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত লেখার উপকরণগুলো সম্ভবত এ জাতীয় ধারা সৃষ্টিতে প্রভাব বিস্তার করেছিল। উপকরণসমূহ ছিল– উটের হাড়, মৃৎপাত্রের ভাংগা টুকরো,পাথরের চ্যাপ্টা খন্ড ইত্যাদি। অষ্টম শতকের দ্বিতীয় ধাপে কুফিক রীতি পরিশীলিত রূপ লাভ করে। এই লিপির ব্যবহার কুরআন অনুলিখনে[৫], শিলালিপি ও মুদ্রা উৎকীর্ণে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে

দাপ্তরিক দলিল-দস্তাবেজ প্রণয়নে লক্ষ্য করা গিয়েছে। উপমহাদেশে মুসলিম বিজয়ের প্রাথমিক পর্বে সীমিতভাবে কুফিক রীতির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।[৬]

খ. নাস্‌খ ঃ কুফিক পদ্ধতির বিবর্তনের পরবর্তী সময় নাস্‌খ লিখন পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে।[৭] এই পদ্ধতিতে বর্ণমালার লম্বদণ্ড ও আনুভূমিক বাহু ঢালু করে উপস্থাপন করা হয়। এতে অক্ষর সমূহ গোলাকৃতি রূপ লাভ করে। হিজরী সপ্তম শতাব্দী (ত্রয়োদশ শতাব্দী) থেকে নাস্‌খ পদ্ধতি কুফিক পদ্ধতির স্থান দখল করে নেয়।[৮] সরকারী দলিলপত্র ও কুরআনের অনুলিপি ক্রমে নাস্‌খ পদ্ধতিতে লিখিত হতে থাকে। ত্রয়োদশ শতকে নাস্‌খ পদ্ধতির বিকাশ সর্বত্র ঘটলেও কুফিক লিখন পদ্ধতিকে শুধু অলংকরণের কাজে বেশী ব্যবহার করা হতে থাকেএবং ইমারতের গায়ে অলংকরণ ও শিলালিপি লেখার কাজে এর সীমিত ব্যবহার দেখা যায়।

গ. তালীক ও নাসতালীক ঃ প্রাচীন পাহলবী লিখন পদ্ধতির সংস্পর্শে এসে পারস্যে আরবী লিখন পদ্ধতি একটি নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করে, তালীক নামে পরিশীলিত লিখন পদ্ধতি ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে বিকাশ লাভ করে। কিন্তু তালীক পদ্ধতির স্থায়িত্বকাল ছিল অল্প দিনের। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে তালিক পদ্ধতির সাথে নাস্‌খ পদ্ধতির মিশ্রণ ঘটে নাসতালীক নামে নতুন একটি লিখন পদ্ধতির বিকাশ ঘটে। এটি ছিল গোলাকৃতি পদ্ধতির লিপি। নাস্‌খ এর চেয়ে নাসতালীক পদ্ধতির গোলাকৃতি পরিধি অনেক বেশী বিস্তৃত এবং বাঁকসমূহ অনেকটা ঢালু। শব্দ ও বর্ণের শেষে এই বাঁক বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সাধারণত এই লিপি ডান থেকে বাম দিকে ঢালু হয়ে নেমে যায়। বর্ণের এই ঢালু বিন্যাসকে অনেক সময় আঁকাবাঁকা ও তরংগায়িত বলে মনে হয়। শৈল্পিক দিক থেকে এই রীতি অনেক বেশী আকর্ষণীয়।[৯] মোগল আমলে ইমারতের গায়ে অলংকরণের কৌশল হিসেবে নাসতালীকের অধিক ব্যবহার হয়েছে। তবে নাসতালীক রীতির মূল চর্চাকেন্দ্র ছিল ইরান। এখানে ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হস্তলিখনবিদ মামহুদ নিশাপুরী নাসতালীক লিপিতে কুরআনলিখেছিলেন।[১০]

তোঘরালিপি ঃ সুলতানী বাংলার শিলালিপির মুখ্যধারা

বাংলার মুসলিম শাসন যুগের সূচনা লগ্নেই আকর্ষণীয় শৈল্পিক অলংকরণসমৃদ্ধ শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। অলংকৃত এই লিপি তোঘরা নামে পরিচিত। তোঘরা কোন স্বতন্ত্র লিখন পদ্ধতি নয় প্রচলিত পদ্ধতিরই শিল্পমান সমৃদ্ধ একটি প্রকাশ মাত্র। শিল্পীগণ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে বিমূর্ত অলংকরণের জন্য আরবী বর্ণমালাকে কখনও লম্ব কখনও সমান্তরাল আবার কখনও বক্রাকারে অবস্থাভেদে সম্প্রসারিত ও সংকুচিত করে উপস্থাপন করেছেন।

সুলতানী বাংলার বিভিন্ন স্থাপত্যের গায়ে পাওয়া শিলালিপি সমূহে বিভিন্ন আকৃতির অলংকৃত তোঘরা লিপি দেখা যায়। সমগ্র বিশ্বের হস্তলিখন শিল্পের সাথে বাংলার এই তোঘরা লিপির লিখন কৌশলের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই আকর্ষণীয় ও অভিনব লিখন কৌশল অবশ্যই বাংলার একটি স্বতন্ত্র অবদান।[১১] তবে তোঘরা রীতির লিখন কৌশল অটোমান সুলতানদের হাতে পরিচর্যা লাভ করেছিল বলে জানা যায়।[১২] এই লিপির কোন কোনটির আকৃতি ধনুকের মত বক্র, কোন কোনটি জলকেলিরত হাঁসের পালের মত,কোনটি গ্রামের চালাঘরের আকৃতিতে অংকিত।[১৩] তোঘরা লিপির অলংকরণে এ জাতীয় আরও অনেক দৃশ্য–চিত্র কল্পনা করা চলে। এর সপক্ষে কতগুলো উদাহরণ দেয়া হচ্ছে, যেমন– ধনুক বক্র আকৃতির সাক্ষ্য বহন করছে শামসউদ্দিন ইউসুফ শাহের (৮৭৯–৮৮৬ হিঃ/১৪ ৭৪–১৪৮১ খ্রীঃ) রাজশাহীর সুলতানগঞ্জ শিলালিপিতে। সাধক সুলতান শাহের সমাধির পূর্ব দরোজায় শিলালিপি সাঁটা রয়েছে। লিপিগুলোর আলিফ الف ও লাম لام খাঁড়াভাবে এবং নুন نون আনুভূমিকভাবে অংকিত রয়েছে। সামগ্রিকভাবে শিলালিপিটি দৃশ্যত তীর-ধনুক আকৃতি বলে মনে হয়। উদাহরণ হিসেবে নিম্নের চিত্রটি লক্ষ্য করা যেতে পারে।

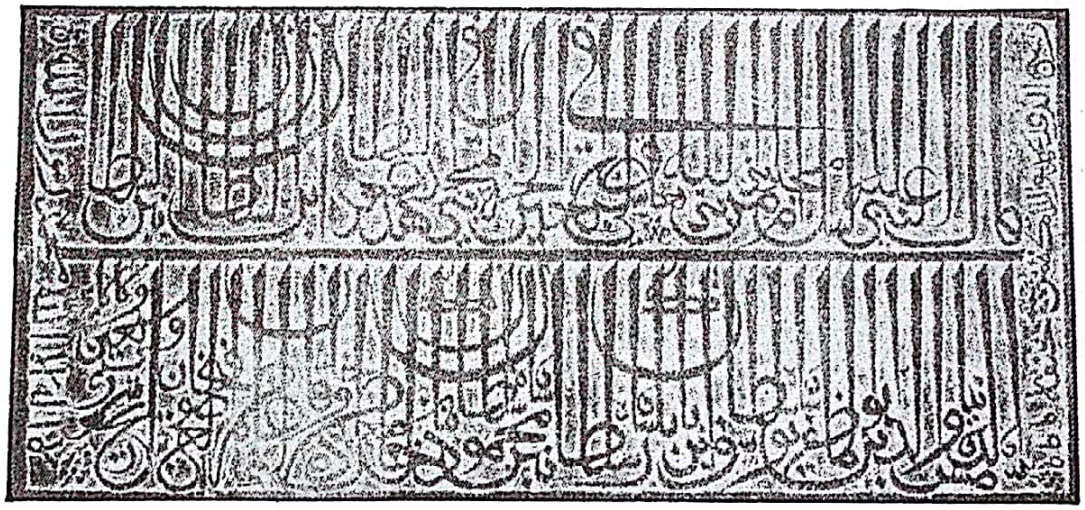

রাজশাহীর সুলতানগঞ্জে প্রাপ্ত
সুলতান শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহের শিলালিপি

সুলতান শামসউদ্দীন মুজাফফর শাহের (৮৯৬–৮৯৯ হিঃ/১৪৯০–১৪৯৩ খ্রীঃ) সময় মালদহের এক জামে মসজিদে উৎকীর্ণ শিলালিপির অলংকরণে বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। শিলালিপির উর্ধ্বস্তরে মনে হবে এগিয়ে চলা সারিবদ্ধ হাঁস।

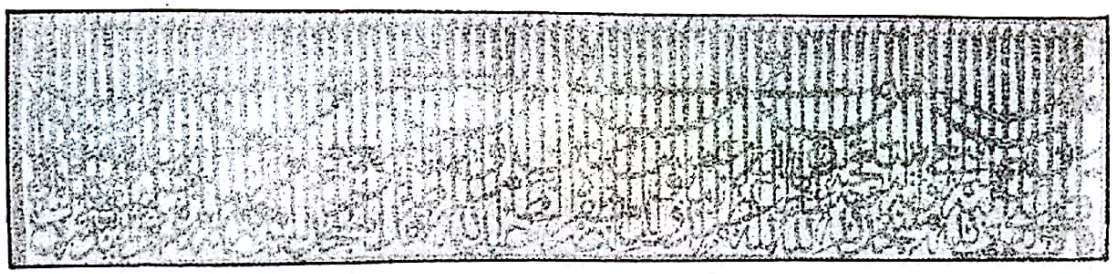

মালদহে প্রাপ্ত সুলতান শামসুদ্দিন
মুজাফ্‌ফর শাহের শিলালিপি

আলাউদ্দিন হুসেন শাহের মুর্শীদাবাদে প্রাপ্ত শিলালিপিতেও একই রীতির তোঘরালিপি দেখা যায়। খুলনা জেলার আরশানগরে এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদে প্রাপ্ত তোঘরালিপির একটি শিলালিপি বর্তমানে বরেন্দ্র গবেষণা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দে এই শিলালিপির অলংকরণ শৈলী এমন যেন মনে হবে কুড়ে ঘরের চালা।[১৪]

সময়ের আবর্তনের সাথে সাথে লিপি অংকনে দক্ষতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই পঞ্চদশ শতকে এসে দেখা যায় পাথরের গায়ে লিপি উৎকীর্ণ করতে গিয়ে তা অনেক বেশী অলংকার সমৃদ্ধ করে তোলা হচ্ছে।[১৫]

শিলালিপির সীমিত পরিসরে খুব বেশী বক্তব্য প্রকাশের অবকাশ নেই। তথাপি গবেষক বিশ্লেষণের পথ ধরে শিলালিপিকে ইতিহাস পূণর্গঠনের গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যিক জনহিতকর নির্মাণাদির গায়েই সংশ্লিষ্ট নির্মাতাগণ লিপি উৎকীর্ণ করে স্থাপন করতেন। ফলে স্থাপনা সমূহের নির্মাণকাল, সংশ্লিষ্ট নির্মাতা, শাসনকর্তা বা সুলতানদের পরিচয় এবং নির্মাণের উদ্দেশ্য জানার পাশাপাশি স্থাপনা সমূহের চরিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ ঘটে। অনেক সময় শিলালিপি সমূহের বক্তব্যের ভেতরেও সমকালীন সমাজ ও সংস্কৃতির ইংগিত খুঁজে পাওয়া যায়।

সুলতানী বাংলায় যে একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল শিলালিপির সাক্ষ্যে তার স্পষ্ট প্রমাণ মেলে। মুসলিম শাসকগণ তাঁদের ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথে মুসলমান সমাজ গঠনে আত্মনিয়োগ করেন এবং শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য মাদ্রাসা গড়ে তোলেন।[১৬] এ প্রসংগে শিলালিপির প্রথম সাক্ষ্য দেখা যায় সুলতান রুকনউদ্দিন কাইকাউসের শাসনকালে হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে জাফর খানের মসজিদে প্রাপ্ত একটি দীর্ঘ শিলালিপিতে। এই শিলালিপিতে ৬৯৮ হিজরীতে জাফর খান কর্তৃক ত্রিবেণীতে স্থাপিত একটি মাদ্রাসা সম্পর্কে বক্তব্য রয়েছে। নাস্‌খ পদ্ধতিতে খুব সরলভাবে লিপি উৎকীর্ণ করা হয়েছে। তাই পাঠোদ্ধারে তেমন কোন সমস্যা হয়নি। শিলালিপি পাঠে দেখা যায় ধর্মীয় প্রেরণায় জ্ঞানের

বিস্তারের জন্য এই মাদ্রাসা তৈরী করা হয়। শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত টাকা খরচ করা হতো। এখানে মুসলিম আইন সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হতো।[১৭] আরও অনেক শিলালিপিতেই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সাক্ষ্য রয়েছে। সুলতান শামসউদ্দিন ফিরুজ শাহের সময় ত্রিবেণীতে জাফর খানের সমাধি গাত্রে প্রাপ্ত ৭১৩ হিজরীতে উৎকীর্ণ এই শিলালিপিতে দারুণ খয়রাত (دارالخيرات) নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার স্বীকৃতি রয়েছে।[১৮] সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের সময় একটি শিলালিপি পাবনা জেলার তাড়াশ থানার অন্তর্ভুক্ত নবগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া যায়। ৮৫৮ হিজরীতে উৎকীর্ণ তিন সারিতে লেখা এই শিলালিপির শেষ সারিতে উল্লিখিত বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ আলীম, জ্ঞানী ও শিক্ষার্থীদের পারিতোষিক দান করতেন।[১৯] ইংলিশ বাজারে এক মসজিদগাত্রে ৯০৭ হিজরীতে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। আলাউদ্দিন হুসেন শাহের তৈরী একটি মাদ্রাসার বর্ণনা এখানে রয়েছে। লিপিতে স্পষ্টতঃই উল্লেখ রয়েছে মাদ্রাসা স্থাপনের মুখ্য লক্ষ্য হচ্ছে ধর্মবিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান।[২০] সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, মুসলিম সুলতান এবং তাঁদের প্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় সমকালীন সময়ে শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ সাধিত হয়েছিল।

সুলতানী যুগের শিলালিপি সমূহের সিংহভাগই পাওয়া গিয়েছে মসজিদের গায়ে। অর্থাৎ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর মসজিদ নির্মিত হয়েছে। মুসলিম সমাজ বিকাশের সাথে মসজিদ নির্মাণের সম্পর্ক জড়িত। কারণ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম বসতির পাশাপাশি মসজিদ নির্মাণ একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। তাই শিলালিপির সাক্ষ্যে সময়ের বিচারে বাংলার বিভিন্ন অংশে মসজিদের অবস্থিতি মুসলিম সমাজের ক্রম বিস্তারের ইংগিত বহন করে। শিলালিপিতে মসজিদ নির্মাণের তারিখ, উদ্দেশ্য, নির্মাতার নাম এবং সমকালীন শাসনকর্তা বা সুলতানের নাম ক্ষোদিত থাকতো। ফলে সময়, শাসনকর্তা ও স্থানের বিচারে মুসলিম সমাজ বিকাশের একটি চিত্র আবিষ্কার করা সহজ হয়ে পড়ে। মুসলিম শাসন যুগের প্রথম দিকে বাংলায় মুসলিম শাসন কর্তৃত্ব ব্যাপক বিস্তৃত হয়নি। ফলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মসজিদ গড়ে ওঠার সপক্ষে শিলালিপির সাক্ষ্য নেই। প্রথম পর্যায়ের উদাহরণ হিসেবে সুলতান রুকনউদ্দিন কাইকাউসের সময়কালের একটি শিলালিপিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। দিনাজপুর জেলার দেবকোটে একটি মসজিদ নির্মাণের সময় এই শিলালিপিটি ক্ষোদাই করা হয়। নির্মাণ তারিখ ৬৯৭ হিজরী (১২৯৭ খ্রীঃ)।[২১] বখতিয়ার খলজী তিব্বতের বিরুদ্ধে ব্যর্থ অভিযান শেষে এখানে মৃত্যুবরণ করেন।[২২] দেখা যাচ্ছে বখতিয়ার খলজীর সময় থেকেই দেবকোটে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফলে একই শতাব্দীর শেষলগ্নে এসে আলোচ্য মসজিদের সাক্ষ্য এই অঞ্চলে মুসলিম সমাজ বিকাশকে নিশ্চিত করে।

সুতরাং একথা স্পষ্ট যে মুসলিম শাসন ব্যাপক বিস্তারের পাশাপাশি মুসলিম সমাজও বিস্তৃত হয়েছিল। তাই গৌড়, মালদহ, পাণ্ডুয়া থেকে শুরু করে উত্তর বংগের বিস্তৃত অঞ্চল, এবং ঢাকা ও তার চারপাশ পর্যন্ত মসজিদের অবস্থান সম্পর্কে শিলালিপি পাঠে নিশ্চিত হওয়া যায়। মুসলিম সমাজ গড়ে ওঠার সাথে সাথে সমাজ জীবনের আবশ্যিক অংগ হিসেবে যেহেতু মসজিদ নির্মিত হতো তাই বলা চলে শিলালিপির এ জাতয়ী সাক্ষ্য আমাদের সমকালীন সামাজিক ইতিহাস রচনায় বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

মুসলিম শাসন যুগের শুরু থেকে পরবর্তী সময় পর্যন্ত শিলালিপি সমূহের লিপি বিন্যাস লক্ষ্য করলে তাতে শিল্পীদের ক্রম দক্ষতার নিদর্শন সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে। এতেকরে সংশ্লিষ্ট সময়ে এদেশে একটি লিপি অংকনের শিল্পী সমাজ গড়ে উঠেছিল– এ সম্পর্কে ধারণা করা চলে। এই ধারণা আরও প্রমাণিত হয়ে ওঠে শিলালিপির সাক্ষ্য থেকেই। যেমন– প্রথম গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহের উযীরবেলেডাঙা শিলালিপিকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। দুই অংশে চার সারিতে লেখা এই শিলালিপির সর্বশেষ সারিতে লিপিকর হিসেবে মুহম্মদ বিন মুহম্মদ বিন আহমদ নাম উল্লিখিত রয়েছে।[২৩] পূর্বে শিলালিপিতে লিখন শিল্পীদের নাম উৎকীর্ণের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সিকান্দর শাহের দেবকোট শিলালিপিতে লিখন শিল্পী হিসেবে 'যারিনদাস্ত' নাম উৎকীর্ণ হয়েছে।[২৪] যারিনদাস্ত (زرین دست) শব্দের আভিধানিক অর্থ 'স্বর্ণহস্ত'। ধারণা করা যায় যে, লেখকের দক্ষতার স্বীকৃতি হিসেবে তার হাতকে স্বর্ণের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে ইসলামের বিকাশ ও মুসলিম সমাজ বিস্তারে সুফী সাধকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এদেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টিতেও সুফী সাধকদের কর্মপ্রয়াস লক্ষণীয়। আবার কখনও বিপরীত ঘটনাও ঘটতো। সুফী ধারার বিস্তার বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অংগনকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। শিলালিপির সাক্ষ্য সুফীদের অবস্থান এবং কর্মভূমিকা সম্পর্কে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে সক্ষম। আরশা শ্রীহট্ট প্রসংগে আমরা শামসউদ্দিন ফিরুজ শাহের সময় উল্লেখকারী যে শিলালিপিটির কথা উপস্থাপন করেছি সেখানে সিলেটে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও মুসলিম সমাজ গড়ায় শাহ্ জালাল পদক্ষেপ নিয়েছিলেন বলে ইতিহাসে স্বীকৃত। আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সময় সিলেটে হযরত শাহ জালালের দরগায় প্রাপ্ত ৯১১ হিজরীতে (১৫০৫ খ্রীঃ) উৎকীর্ণ শিলালিপিতেও হযরত শাহ জালালের কথা রয়েছে।[২৫] শয়খ জালাল মুহাম্মদ তাব্রিজী নামে আরেকজন সুফীর নাম পাওয়া যায়। শিলালিপির সাক্ষ্যে (৯৩৪ হিজরী/১৫২৮ খ্রীঃ) নাসিরউদ্দিন নুসরত শাহের সময়ে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে এই সাধকের পূর্ণ নাম পাওয়া

যায়। শিলালিপির বিন্যাস নিম্নরূপ ঃ

২৬ فی البلاد شیخ جلال محمد تبریزی

এই সাধকের দরগাহ পাণ্ডুয়ার ১৫ মাইল উত্তরে দেওতলী নামক স্থানে অবস্থিত। সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁর গুরুপূর্ণ প্রভাবের স্বাক্ষর পাওয়া যায় পরবর্তীকালে সুলাইমান কররাণীর সময়ে ৯৭৮ হিজরীতে (১৫৭১ খ্রীঃ) উৎকীর্ণ একটি শিলালিপিতে। এখানে দেখা যায় যে, শয়খ জালাল মুহম্মদ তাব্রিজীর নামানুসারে দেওতলার নামকরণ করা হয় তাব্রিজাবাদ। আলোচ্য লিপির বিন্যাস নিম্নরূপ ঃ

২৭ فی القصبة المبارکة تبریزاباد عرف دیوتالہ

অর্থাৎ অঞ্চলটি গৌরবান্বিত তাব্রিজাবাদ ওরফে দেওতলা।

ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, এই সাধক দেওতলায় সমাহিত হয়েছিলেন।[২৮] বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে আগত সুফীদের মধ্যে আঁখি সিরাজউদ্দিন উসমান অত্যন্ত খ্যাতিমান। সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সময়ে গৌড়ের সাগরদীঘির উত্তর পশ্চিম কোণে এই সাধকের সমাধি গৃহের দরজায় প্রাপ্ত লিপিতে তাঁর নাম পাওয়া যায়। উৎকীর্ণকাল ৯১৬ হিজরী (১৫১০ খ্রীঃ)। লিপি বিন্যাস –

২৯ شیخ اخی سراج الدین

আঁখি সিরাজউদ্দিন দিল্লীতে প্রখ্যাত সাধক নিযামউদ্দিন আউলিয়ার স্নেহভাজন ছিলেন এবং ফখরউদ্দিন জাবাদীর নিকট বিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত করেন। জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করার পর গুরুর নির্দেশে এক সময় তিনি বাংলায় আসেন। এখানেই ৭৫৮ হিজরী অর্থাৎ ১৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। লখনৌতির সমস্ত সুলতান তাঁর অনুসারীতে পরিণত হয়েছিলেন।[৩০] সুতরাং সমকালীন লখনৌতির সমাজ ও সংস্কৃতির অংগনে স্বাভাবিকভাবেই এই সাধকের ভূমিকা অন্বেষণ করা যাবে। বাংলায় মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতি বিকাশে আর এক ব্যক্তিত্ব আলাউল হকের সাক্ষ্য রয়েছে শিলালিপিতে। সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহের সময় কলিকাতার বানিয়াপুকুর এলাকায় একটি মসজিদের গায়ে এই শিলালিপিটি ছিল। উৎকীর্ণকাল ৭৪৩ হিজরী (১৩৪২ খ্রীঃ)। শিলালিপিতে সাধকের নাম ছিল–

৩১ علاء الحق والدین

তিনি পাণ্ডুয়াতে খানকাহ্ গড়ে তুলেছিলেন। এখানে দরিদ্র, পর্যটক ও ছাত্রদের খাদ্য এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল। তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে সিকান্দর শাহ তাঁকে সোনারগাঁওয়ে নির্বাসিত করেন। দুই বৎসর পর তিনি আবার পাণ্ডুয়াতে ফিরে আসেন।[৩২]

সুলতানী যুগে বাংলায় সুফী হযরত নূর কুতব আলম-এর নাম সুবিদিত। মুজাফফর শাহের সময় হযরত পাণ্ডুয়ায় নূর কুতব আলমের দরগায় প্রাপ্ত শিলালিপিতে বিশেষণ সহ এই সাধকের দীর্ঘ নাম উদ্ধৃত রয়েছে। লিপি উৎকীর্ণের তারিখ ৮৯৮ হিজরী (১৪৯৩ খ্রীঃ)। লিপি বিন্যাস–

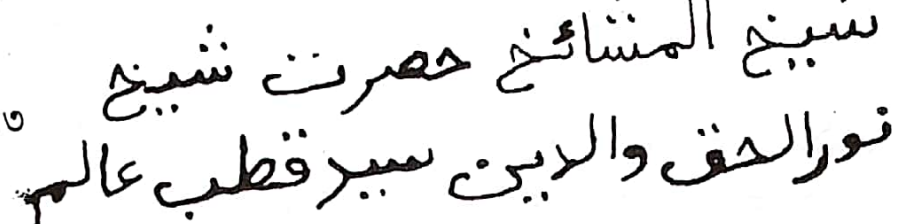

৩৩

বাংলায় মুসলিম শাসন ও সমাজের ভিত্তি ভূমিতে রাজা গণেশের অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সাময়িকভাবে হিন্দু রাজত্বের পুণরুত্থানের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল সমাজ জীবনে তার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব প্রতিফলিত হয়। এই ঘটনা–প্রবাহের সাথে নূর কুতব আলমের সংশ্লিষ্টতা স্পষ্ট। তিনি জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীকে প্ররোচিত করেছিলেন রাজা গণেশকে দমন করার জন্য[৩৪] এবং সুফীর আহ্বানে সুলতানও সাড়া দিয়েছিলেন। নূর কুতব আলম সুফী আলাউল হকের সুযোগ্য পুত্র ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি সাফল্যের সাথে পিতার নির্মিত খানকাহ পরিচালনা করেছিলেন।[৩৫] বেশ কিছু শিলালিপিতে মাওলানা আ'তা নামে আরেকজন সুফীর নাম পাওয়া যাচ্ছে। প্রথম শিলালিপিটি সিকান্দর শাহের সময়ে ৭৬৫ হিজরীতে (১৩৬৩ খ্রীঃ) উৎকীর্ণ করা হয়েছে। দেবকোটে সুফী মাওলানা আ'তার দরগার গায়ে পাওয়া যায়।[৩৬] দ্বিতীয় শিলালিপি জালালউদ্দিন ফতেহ শাহের সময়ে রাজশাহীতে প্রাপ্ত। এই শিলালিপিটি দেবকোট থেকেই হয়তো আনা হয়েছিল। উৎকীর্ণকাল ৮৮৭ হিজরী (১৪৮২ খ্রীঃ)[৩৭] তৃতীয় শিলালিপিটি শামসউদ্দিন মুজাফফর শাহের সময়ে মাওলানা আ'তার দরগায় প্রাপ্ত। এই লিপির উৎকীর্ণকাল ৮৯৬ হিজরী (১৪৯১ খ্রীঃ)।[৩৮] চতুর্থ শিলালিপিটি হুসেন শাহের সময়ের। এটিও মাওলানা আ'তার দরগায় প্রাপ্ত। উৎকীর্ণকাল ৯১৮ হিজরী (১৫১২ খ্রীঃ)।[৩৯] শিলালিপির সাক্ষ্যে এমনিভাবে আমরা সুফী–সাধকদের অবস্থান সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারি এবং তাঁদের ভূমিকা সম্পর্কে সেখানে কিছু কিছু ধারণা করার অবকাশ থাকে। ফলে এর সূত্র ধরে সমাজ–সংস্কৃতির ইতিহাস অন্বেষণ অনেকটা সহজ হয়ে পড়ে।

সুলতানী যুগে কিছু কিছু শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। যা বিভিন্ন জনহিতকর স্থাপনার স্বাক্ষর বহন করে। যেমন, সেতু নির্মাণ, কুয়ো নির্মাণ ইত্যাদি। মসজিদ–মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা যেমন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সামাজিক–সাংস্কৃতিক জীবনের সন্ধান দেয় তেমনি এসমস্ত জনহিতকর কার্যক্রম সমাজ জীবনের সেই ধারাকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। যেমন ঃ

নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের সময় গৌড় শহরের দক্ষিণ দিকের প্রধান প্রবেশ পথে কোতয়ালী ফটক এবং লাটন মসজিদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী একটি ইটের তৈরী সেতু রয়েছে। ৮৬২ হিজরীতে (১৪৫৭ খ্রীঃ) উৎকীর্ণ শিলালিপিতে এই সেতু নির্মাণের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। নির্মাণকারী সুলতান হিসেবে নাসির-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ্দীন আবুল মুজাফফর মাহমুদ শাহের নাম উৎকীর্ণ রয়েছে।[৪০] রুকনউদ্দিন বারবক শাহের সময় গৌড়ের দাখিল দরোজার নিকট প্রাপ্ত একটি শিলালিপিতে সুলতান কর্তৃক ফটক ও পানির নহর তৈরীর সাক্ষ্য বিদ্যমান। লিপি উৎকীর্ণকাল ৮৭১ হিজরী (১৪৬৬ খ্রীঃ)। ১৭ লাইনে লেখা এই দীর্ঘ শিলালিপির একাদশতম লাইন নহর নির্মাণের উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। লিপি বিন্যাস নিম্নরূপ –

৪১ نهر جرعا تحتها كالسلسبيل
سجا لها فاز بالفقراء ذى المحن

স্বর্গের ঝর্ণাধারার মত একটি পানির নহর প্রাসাদের নীচ দিয়ে প্রবাহিত। এই নহর পীড়িত ও দরিদ্রদের জন্য সান্ত্বনা স্বরূপ। এ থেকে সামাজিক জীবনের কল্যাণের জন্য সুলতানদের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

মুর্শীদাবাদ জেলায় শেখের দীঘি (অথবা সাগর দীঘি) নামে প্রকাণ্ড এক দীঘি মধ্যযুগের সমাজ জীবনে বাংলার সুলতানদের ভূমিকা গ্রহণের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ৯২১ হিজরীতে (১৫১৫ খ্রীঃ) এই পুকুরটি খনন করান বলে শিলালিপির সাক্ষ্য থেকে জানা যায়।[৪২] হুসেন শাহের সময় পানীয় জলের স্থান (سقابة) নির্মাণের আরেকটি নিদর্শন পাওয়া যায় ৯২২ হিজরীতে (১৫১৬ খ্রীঃ) উৎকীর্ণ শিলালিপিতে।[৪৩] এটি বীরভূম জেলার প্রাচীন বাদশাহী সড়কের পাশে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদের গায়ে পাওয়া যায়। সুলতান নাসিরউদ্দিন নুসরত শাহের সময় সোনারগাঁওয়ের নিকট সাদিপুরে প্রাপ্ত শিলালিপিতে একটি মসজিদ ও তার সন্নিকটে খাবার জলের জন্য কুয়ো খননের স্বীকৃতি রয়েছে। স্থাপনকারী হিসেবে আইন বিশারদ ও হাদিসের শিক্ষক 'মালিক-উল-উমরা -আল-ওয়াজারা' নাম উৎকীর্ণ আছে। তিনি সুলতান কর্তৃক নিয়োজিত একজন কর্মকর্তা ছিলেন।[৪৪] নুসরত শাহের নামোল্লিখিত আরেকটি শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। প্রাচীন মালদার চালিশপাড়া অঞ্চলে প্রাপ্ত এই লিপি থেকে জানা যায় 'বুয়ামালতি' (بوا مالتى) নামের এক মহিলা একটি কুয়োর উপর আচ্ছাদন তৈরী করেন। (লিপিতে উৎকীর্ণ

(سقایه), উৎকীর্ণকাল ৯৩৮ হিজরী (১৫৩১–৩২ খ্রীঃ)।[৪৫]

সার্বিক আলোচনায় সুলতানী যুগে বাংলায় শিলালিপির বৈশিষ্ট্য সমূহের একটি পরিচিতি দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল মুখ্যত সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনায় সম্ভাব্য ভূমিকা স্থাপনকারী নিদর্শন সমূহের দিকে। প্রসংগক্রমে শিলালিপি সমূহের বৈশিষ্ট্য, বক্তব্য বিষয়সমূহ, মুদ্রা ও শিলালিপিতে নির্দেশিত ভৌগোলিক স্থানের পরিচিতি, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার বিভিন্ন দিক– যে সমস্ত ক্ষেত্রে শিলালিপি তথ্যের সন্ধান দিতে পারে– তা আলোচনা করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এরই পথ ধরে মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস, বিশেষ করে সামাজিক–সাংস্কৃতিক ইতিহাস চর্চায় গবেষকের পথ প্রশস্ত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

তথ্যনির্দেশ

১. **Shamsuddin Ahmed**
Inscriptions of Bangal, Varendra Research Museum Rajshahi- 1960.

২. **Thomas W. Arnold**
Painting in Islam, M. C. M. XXXV 111, Oxford at the clarandon press, 1928, P-2.

৩. **Khan Shahib Maulavi Zafar Hasan**
Specime of Calligraphy in the Delhi Museum of Archeaology, Memoirs of the Archaeological Survey of India. No-29, 1926;
M. Ziauddin
A Monograph on Moslem Calligraphy, Visva- Bharati stadies No. 6, Calcutta- 1936- p-16;
Yasin Hamid Safadi
Islamic Calligraphy, London, Thames & Hudson L T D 1978, P. 7.

৪. **M. Ziauddin**
A Monoghaph of Moslem Calligraphy, p-2

৫. প্রথম পাঁচ শতাব্দী ব্যাপী এই রীতির বিভিন্ন ধারায় কুরআনের অনুলিখন চলে আসছিল ঃ
M. Ziauddin
P-16;
Yasin Hamid Safadi
Islamic Calligraphy, P-10

৬. **S. Ahmed**
IB, IV, P-XIII

৭. **Allami Abul Fazal**
Ain-i-Akbari, Tr. H. Blochmann Calcutta, ASB, 1873;
M. Ziauddin
P-45
৮. **Zafar Hasan**
Muslim Calligraphy-Indian Art and Letter, Vol-IX on 1935 P- 61.
S. Ahmed
IB-IV গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন যে,নাস্‌খ পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে ষষ্ঠ হিজরী-তে (দ্বাদশ শতকে)।
৯. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী
মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯, পৃঃ-৩১৪
১০. **Annemarie Schimmel**
Calligraphy and Islamic Culture, NewYork University Press, 1984 P-30.
১১. **Pares Islam Syed Mustafizur Rahman**
Islamic Calligraphy in Medieval India, Dhaka, UPL 1979, P-XI.
১২. **Yasin Hamid Safadi** P-31
১৩. **Pares Islam** PP. 50-51;
এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী
মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প, পৃঃ-৩৪১, ৩৪২
১৪. **A. K. M. Yaqub Ali**
Selected Arabic and Persian Epigrahps, Islamic Foundation Bangladesh, 1988, P-11.
১৫. **Annemarie Schimmel** P-26
১৬. আবদুল করিম
বাংলার ইতিহাস, (সুলতানী আমল) ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭ পৃঃ ৭০
১৭. **S. Ahmed** *IB-IV*, PP 19-20
১৮. **Ibid** PP. 28-29
১৯. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী
মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প, পৃঃ-৩৫৪
২০. **A. H. Dani** *Bib*, P-49
২১. **S. Ahmed** *IB-IV*, PP. 15-18
২২. আবদুল করিম
বাংলার ইতিহাস, পৃঃ ৭৩
২৩. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী
মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প, পৃঃ-৩৪১
২৪. **A. H. Dani**
Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal, Asiatic Society of Pakistan, 1957, P-12.
২৫. **Enamul Haq**
A History of Sufi-ism in Bengal, Dacca Asiatic Society of Bangladesh, 1975, P-169.

২৬. **Abid Ali**
Memoirs of Gaur and Pandua, Calcatta, Bengal Secretariate Book Depot-1924. P-171
২৭. **Ibid** P-170
২৮. **Syed Hasan Askari**
New Light on Rajah Ganesh and Sultan Ibrahim Sharqi of Jounpur from Contemporary Correspondence of Muslim Saints, Bengal Past and Present Vol-LXVII, 1948 P-35
২৯. **Abid Ali** *Memoirs*, P-90
৩০. **H. Blochmann**
Contributions to the Geography and History of Bengal, Asiatic Society of Bengal, Calcutta-1968
৩১. **A. H. Dani** *Bib*, P-10
৩২. **Enamul Haq** *Sufi-ism*, P-170
৩৩. **Abid Ali** *Memoirs*, P-114
৩৪. **Syed Hasan Askari** *New Light*, B. P. P., P-33
৩৫. **Enamul Haq** *Sufi-ism*, P-172
৩৬. **S. Ahmed** *IB-IV*, PP. 34-35
৩৭. **Ibid** P-115
৩৮. **Ibid** P-143
৩৯. **A. H. Dani** *Bib*, P-57
৪০. **S. Ahmed** *IB-IV*, P-59
৪১. **Ibid** P-86
৪২. **Ibid** P-194
৪৩. **A. H. Dani** *Bib*, P-60
৪৪. **S. Ahmed** PP. 209-210
৪৫. **Abid Ali** *Memoirs*, P-153

A Review of Research on Archaeological Site Formation Process

Dr. Syed M. K. Ahsan

Abstract : In this paper an attempt has been made to summarize the research on archaeological Site Formation Processes around the world. This discussion shows that for reliable interpretation of archaeological remains and for perfect reconstruction of past human life ways and palaeo-environment of an archaeological site, it is necessary to study associated Site Formation processes.

Introduction

The world itself is a changing phenomenon. As time passes all it's systems (physical, chemical and biological) changes as a result of number of processes which are in flux since the origin of the earth. As archaeologist, we are attempting to understand mankind's past behaviour ever since his emergence. The task of deriving information regarding past human behaviour from archaeological remains is indeed formidable. We know that archaeological remains consist of complex aggregates of cultural and noncultural facts. The pattern of distribution of artifacts at a site in situ does not necessarily reflect the archaeological pattern of human behaviour. Observed archaeological sites along with archaeological remains are not the same as they were at the time of past human occupation and subsequent abandonment. Between site occupation and site discovery, a variety of erosional and depositional processes affect the site

and modify the original archaeological pattern. Weathering, accumulation and transport of materials also lead to the re-organization of the distribution pattern of the archaeological remains. Besides these, on going cultural system also have an added effect on the original archaeological pattern.

So the past human activities, past and present natural processes along with modern human activities create complexity at the archaeological site. Archaeologist call these phenomena 'Site Formation Processes' (Ascher 1968, collins 1975, Cowgill 1970, Schiffer 1976, 1983, 1987, Binford 1976, 1980)

After the emergence of the New Archaeology (Binford and Binford 1968, Clark D. 1968) archaeologist increasingly feel the necessity of studing site formation processes to interpret archaeological remains in a systematic, more reliable and meaningful way.

The geomorphological study of an archaeological site, it's microstratigraphy, and its analysis, chronology and detailed analysis of it's lithology are essential for identifying site formation processes.

Processes. influence the aecumulation, modification, and location of archaeological remains are numerous. It is very difficult to identify all the formation processes. The greater the number of formation processes that can be identified, the more meaningful and the more reliable is the interpretation.

Nature of Site Formation processes

All recent studies relating to past human behaviour based on analysis of archaeological record, acknowledge the fact that Site Formation processes influence archaeological sites in a significant way. These influences can be attributed to cultural and non-cultural agencies. Hence they have been divided into two types :

1. Cultural Site Formation processes
2. Noncultural or Natural Site Formation Processes

All artifacts and ecofacts enter into the archaeological context after discard or loss as surficial exposures. So they may be modified and rearranged specially and formally to some degree by on going cultural system of that period. Material may be added, some may be scavenged and reused, till they get buried. The longer the artifacts are exposed the greater chances of modification in artifact patterning. Man's present day land modification processes, like road building, canal reconstraction, land levelling may contribute to the alteration of the context and re-expose the buried archaeological record. These processes are called 'Cultural Site Formation Processes.'

Along with 'Cultural Site Formation Processes' natural processes like fluval activities, aeolian processes, mass movement, faunalturbation, floralturbation, might lead to archaeological record transport, rearranging the distribution pattern and burial of archaeological record. These processes may in turn, re-expose the archaeological record. These processes are called 'Non-cultural or Natural Site Formation Processes'.

Researches on Site Formation Processes

Late Glyn Isaac made one of the first major attempts to understand archaeological 'Site Formation Processes'. His study reflects the understanding of the effects of fluvial activities on the East African Acheulian sites, associated with a sandy substratum of ephemeral streams and washes. He conducted a few simple experiments in the middle of the sixties, on the shore of lake Magadi in Kenya. One hundred concrete clasts of hand axes, cleavers and flakes were placed in five experimental plots chosen along the course of an ephemeral stream draining into lake and inclined to seasonal flash floods. He found that the pieces left in the stream bed with sandy substratum were embedded in it consequent to the flash flood activity, where as those specimens left on the rocky bed were found displaced upto a distance of 75 km. Further more, large artefacts like hand axes and cleavers were found lying in a position transverse

to the direction of current. He used these experimental results to identify the disturbances by natural process in East African Acheulian sites (for details see Isaac 1967).

Such experiments by Isaac opened up a wide range of new experimental studies by his colleagues and students. They are generally refferred to as 'actualistic studies' (Petraglia 1987, Paddaya 1987c). In this regard special note may be made of the following investigations:

a. Diane Gifford's (1980) study on formation processes of the settlements of Dassantech people in Kenya.

b. Nicholas Toth's (1982) work on the stone technology of Koobi Fora Sites, which included detailed analysis and replication of artifacts.

c. Bunn's (1982) study of faunal materials from Koobi Fora and Olduvai Gorge sites from the point of view of homimid diet.

d. Dechant Boaz's (1982) study of the taphonomic processes operating on the modern skeletal material found in a fluvial setting in the Masai Mara game sanctuary and its relevance in the innerpretation of the Plio-pleistocene bone accumulations from the fluviatile deposits in the Omo basin of Ethiopia.

e. Paola villa's (1983) work on the formation processes of the site of Terra Amata.

f. Kaufueu's (1983) study of sixteen Early stone age sites of Kenya, Malawi and Tansania provides some extra-ordinary interpretations of their microstratigraphy and associated Site Formation Processes.

g. Kathy Shick's (1984) detailed experiments concerning natural and cultural processes of site formation and their implications for understanding the Lower pleistocene sites of Koobi Fora.

h. Jean Sept's (1984) investigations of present day riparian vegetation in kenya and the analogies it provides for reconstructing the ecological context of early hominids.

i. Blumenschine's (1985) study of 268 carcasses of herbivores in the Serengali and Ngorongoro crater in Tanzania and its usefulness in estimating caracass types and the parts that could have been availalde to early hominids.

These studies undoubtedly contributed to identify the 'Site Formation Processes' and hence the more reliable and more meaningbut interpretation of archaeological records of respective sites.

Binfond puts forth his middle Range Theory which he defince as : cognitive frame of reference for transforming our observations about the statics of the archaeological record into the statements about its dynamics (Binford 1977 : 6-7). It is basically a frame of reference abstracted from experimental, toponymical and ethnoarehaeologial studies which provides us necessary means for identifying 'Site Fromation Processes' that have acted upon the archaeological record and the cultural patterning preserved there in. On the basis of his research on 'Site Fromation Processes' among the primitive tribes like Nunamuit Eskimos, Binfond has begun to doubt the hitherto prevalent concepts of home base, food sharing, large game hurting etc. generally associated with early hominid groups of eastern and southern Africa and regards them as "myth"s or "just-so-stories" (Binford 1981, 1983)

Then Michael Schiffer, in his "Behavioral Archaeology" lays emphasis on the fact that number of natural and cultural processes (his n-transform and c-transform) must be taken into account before using any archaeological record for proecssual interpretation. He repeatedly draws attention to the tendency among most archaeologists to form an association between the conditions of the archaeological record as it was left behind by its authors and the conditions in which it is found by us todoy, in a one-to-one relationship (Schiffer 1976, 1977, 1983). In this regard he has put forth his four well-known types of processes (S-S, S-A, A-S, A-A processes). In Schiffer's study there is an emphasis on factors like discard, loss, scavenging

and recycling in the formation of archaeological records. Keeping these processes in mind, Schiffer and his colleagues made explicit interpretations regarding the abandonment of some of the south-west American prehistoric sites. For example the extensive evidence of scavenging at the Foote Canyon Pueble shows that this site was not abandoned suddenly, on account of factors like warfare or disease, but gradually (Schiffer 1985).

Further studies of these types are the taphonomic investgatious of workers like C. K. Brian (1981), Anna Behrensmeyer and Andrew Hill (1980), The Use wear studies of Keely (1980) and the geo-arechaeological investigations of Jullie Stein (1982), Gladfelter (1977, 1981), Shakeley (1978), Rice (1976), Turnbaugh (1978) and Fekri Hassan (1978).

Researches in the old stone age in India began in the early sixties of the last century with the discovery of a palaeolithic artifact at Pallavaram near Madras by Robert Bruee Foote in 1863. Generally Known as the first phase or the collection phase, it lasted up to the twenties of the present century. Exploratory works carried out by Foote, William King and others led to a large collection of rich stone age artifacts from peninsular India, parts of Kathiawar, Bengal as well as from the Narmada and Godavari valleys. While Foote was collecting artifacts in different parts of India, he was aware of the secondary nature of artifact bearing diposits and mentioned the probable impact of some geomorphic Processes which may have disturbed the original archaeological pattern (Foote 1866). So in the beginning of old stone age research in India, archaeologits at best acknoledged impact of geomoerphic Processes (today's natural site formation Processes) for the alteration of original archaeological context.

In the second phase, which lasted from the thirties to the fifties of the present century. saw the classification of the Indian Stone Age into four cultural stage (series 1-IV) by Cammiade and Burkitt (1930). The other notable event in this phase was Yale-Cambridge expedition by de Terra and Pattarsons (1939)

in India, which ultimately led to the reconstruction of stone Age cultural sequences in relation to the Himalayan glacial chronology. In this phase archaeologists were eager to establish the cultural sequence and classification. No attention was paid to the impact of geomorphic processes on artifacts.

The third phase which starts with the sixties of this century witnessed an intensification of regional studies with provinces, districts or parts, thereof serving as units of study. If not only furnished fresh data about the nature, and distribation of the Lower Palaeolithic cultures already well established, but also established the existence of the Middle and Upper Palaeolithic cultures. Another important development of this phase was re-orientation of the aims of prehistoric research. It was realized that secondary sites, generally associated with river sediments, and which had almost exclusively engaged the attention of workers in the previous two phases do not help in the reconstruction of prehistoric life ways. As a result emphasis shifted to the discovery and investigation of primary or less disturbed sites interms of ecological settlemant pattern approaches. Ethnoarchaeology and experimental archaeology were also introduced apart from the introduction of scientific techniques, which included absolute dating methods. In the last decade, after the introduction as the New Archaeology, Palaeolithic research in India recieved fresh impetus to study past human behaviour in more systematic, reliable and meaningful way. The detailed studies by V. N. Misra in Bhimbetka, M. P. (Misra 1980, 1982, 1985), Misra and Rajaguru in Didwana, Rajasthan (Misra 1987a, 1987 b, Misra et. al. 1982, 1988, Misra and Rajagura 1986, Raghavan, Rajagura and misra 1989), Paddayya on Hunsgi-Baichbal valley, (Paddayya 1982, 1984 1985, 1987a, 1987b, 1987c, 1991), Corvinus at Chirki, Maharashtra (Crovinus 1981, 1983), Murty in the Kurnool caves, A. P. (Murty 1985, Murty and Reddy 1985), S. Mishra in East Nimar district of M. P (Mishra 1985) are some of the best illastrations of this new phase of work. It was realised from these works that it is necessary to study the associated site

formation process on the archaeological site, to know nature and degree of distarbance in the archaeological patterning.

In India Prof. K. Paddayya first made primary investigation site formation processes associated in the Acheulin occurrence of Humsqi-Baichbal valley (Paddayya & Petraglia, 1990). Then the author (Ahsan 1993) has made an attempt to study the site formation process associated in the palaeolithic sites of sub-humid area of central Narmada valley for his Ph. D dissertation. There are, howerer, a lot of limitations in the study of Site Formation Processes. This type of study requires a researcher, who has sound and expertise in the subject like geology, geomorphology, physics, chemistry history and archaeology. To understand the palaeolithic formation processes, it is necessary to carry out a long term observation on the available modern natural and cultural processes or on reliable experimental set up to get dependable output (Patraglia 1987). To set up experimental studies, it becomes necessary to experiment in differnt climatic zones in different environmental contexts.

Conclusion : Above discussions clearly shows that for reliable interpretation of the archaeological record modern archaeologist studes the Site Formation Processes or at least aware of the impact of thise processes. In Bangladesh no investigation has been made which acknowledge the inpact of Site Formation Processes on the archaeological record. Aim of this paper is to warn our archaeologist about the impact of these processes. They should fake account of the impact as these 'Site Formation Processes' on the archaeological record before processual interpretation.

SELECTED BIBLOGRAPHY

1. Ahsan S. M. K
1993 : A Study of Palaeolithic Site Fromation Processes in

Subhumid Environment of Central India With Special Reference to Samnapur Palaeolithic Site. M. P. Unpublished Ph. D Thesis Deccan College. Poona.

2. Ascher R.

1968 : Time's Arrow and The Archaeology of a Contemporary Community in Settlement Archaeology, ed. by. K. C. Chang, pp 43-52. National Press book, Palo. Alto.

3. Behrensmeyer A. K. and A.P. Hill (ed)

1980 : Fossils in the Making :

Vertebrate Taphonomy and Palaeoecology. University of Chicago press. Chicago.

4. Binford, L. R.

1976 : Forty Seven Trips : A Case Study in the Character of Some Formation Processes of the Archaeological Record in Contributions to Anthropology : The Interior Peoples of Northern Alaska, ed. by E. Hall. PP. 299-351. National Musum of Man Mercury Series 49. Ottawa.

5. 1977 : Greneral Introduction. In For Theory Building in Archaeology ed. by L. R. Binford, PP. 1-10.

AcademicPrese, Newyork.

6. 1980 : Willow Smoke and Dog's Tail : Hunter- Gatherer Settement Systems and Archaeological site Formation. In Amirican Antiquity Vol. 45 : 255-273.

7. 1981 : Bones : Ancient Men and modern myths, Academic Press. Newyork.

8. 1983 : In Pursuit the Past : Decoding the Archaeological Record. Thames and Hudson, London.

9. Binford, S. R. and Binford L. R.

1968 : New Perspectives in Archaeology Aldine Pub. Co. Chicago.

10. Blumenschine R. J.

1985 : Early Hominid Scavanging Opportunities : Insights from the Ecology of Carcass Availability in Screngeti and Ngorongaro Crater, Tanjania Unpublished Ph. D. Dissertation. University of Califonia. Berkeley.

11. Brian C. K

1981 : The Hunters or the Hunted? : An Introduction to African Cave Taphonomy. University of Chicago Press. Chicago.

12. Bunn H. T.

1982 : Meating-Eating and Human Evolution : Studies on the Diet and Subsistance Patterns of Plio-pliestocene Homonids. Unpublished Ph. D Thesis. University of Califounia Berkelery.

13. Cammiade L. A. & M. Burkitt

1930 : Fresh light on the Stone Age in South-East Asia In Antiquity Vol. 4 PP. 327-329.

14. Clarke, D. L

1968 : Analytical Archaeology. Methuen Co. Ltd. London.

15. Collins, M. B

1975 : The Sources of Bias in Processual Data : An Appraisal. In Sampling in Archaeology ed. by J. W. Muller PP. 26-32. University of Arizona press. Tucson.

16. Corvinus G.

1981 : A survey of the Paravara River System in Western Maharashtra. India Vol. 1 : The Stratigraphy and Geomorphology of the Paravara River System, Archaeologica Vendtoria e. v.. Instituete fur Urgeschichte. Tubingun. Germany.

17. 1983 : A Survey of the Pravara River System in Western Maharashtra India Vol. 2 : The Excavation of the Acheulian Site of Chirki-on-Pravara. India. Archaeologica Venetora e. v.. Indstitut fur Urgeschichte. Tubingen. Germany.

18. Cowgill, G. L

1970 : Some Sampling Reliablity Problems in Archaeology. In Archaeologie et Calculateurs : Problems Semilogiques et Mathematiques PP. 161-175. International colloquium. CNRS. Paris.

19. Dechant B. P

1982 : Modern Riverine Taphonomy : Its Relevance to the Interpretation of Plio-Pliestocene Hominids and Palaecology in the Omo Basiar Ethiopia. Unpublished Ph. D. Dissertation Univ of California: Berkeley.

20. de Terra H & T. T. Patterson

1939 : Studies on the Ice Age in India and Associated Human Cultures. Carnegie Institution Washington.

21. Foote R. B.

1866 : On the Occurence of Stone Impliments in Various Pants of Madras and North Arcot Districts. Madras Journal of Letters and Science, Vol. 3 (2) 1-35

22. Gifford D. P

1980 : Ethno-Archaeological contribution to the Taphonomy of Human sites in Fossils in the making : Vertebrate Taphonomy and Palaeoecology ed. By **A. K. Behrensmeyer and A. P.** Hill University of Chicago. Press. Chicago.

23. Gladfelten B. G. Geo-Archaeology :

1977 : The Geomorphologist and Archaeology. In American Antiquity, Vol. 42 (4) : 519-553.

24. 1981 :Developments and Directions in Geoarchaeology In Advances in Archaeological Methods and Theory. ed. by M. B. Schiffer. Vol 4. Acadamic Press. Newyork

25. Hassan F. A

1978 : Sediments in Archaeology : Methods and Implication for Palaeo-environment and cultural analysis. In Journal of Field Archaeology. Vol. 5 : 198-230.

26. Isaac G. L.

1967 : Towards the Interpretation of Occupation Debris : Some Expts and Observation. In Kroeber Anthropological Society Papers. Vol. 37 : 31-57

27. Kaufulu Z. M

1983 : The Geological Context & Some Early Archaeological Sites in Kenya, Malawi and Tanzania : Microstratigraphy, Site Formation- and Interpretation. Unpublished Ph. D. Dissertation, Univ of California, Berkeley.

28. Keeley L. E.

1980 : Experimental Determination of Stone Tools Used, Univ of Chicago Press. Chicago.

29. Mishra S.

1985 : Early man and Environments in Western Madhya Pradesh, Unpublished Ph. D. dissertation Univ of Poona, Poona.

30. Misra V. N.

1980 : The Acheulian Industry of Rock shelter III F-23 at Bhimbetka, Central India : A Preliminary study. Anstralian Archaeology Vol. 8 : 63-100

31. 1982 : Evolution of the Blade Elements in the Stone Industry of Rock Shelter III F- 23, Bhimbetka. In Indian Archaeology: New Perspectives, ed by R. K. Sharma PP. 7-13. Delh

32. 1985 : The Acheulian Succession at Bhimbetka, Central India. In Recent Advances in Indo-Pacific Prehistory, edited by V. N. Misra and P. Bellwood, Delhi.

33. 1987a : Evolution of the Landscape and Human Adaptation in the Thar Desert. Presidential adrss (Anthropology & Archaeology section) 74th session of the Indian science Congrwss, Bangalore.

34. 1987b : Middle Pleistocene Adaptation in India. In The Pleistocene Old World : Regional Perspectives ed. by Olga Soffer. PP. 99-119, Plenun Press Newyork.

35. Misra V. N. Rajagura S. N., Raju D. R. Raghau Ran H and Gaillard.

1982 : Acheulian Occucpation and Evolving landscape around Didwan in the Thar Desert, India, In Man and Environment, Vol. 6 : 72-86

36. Misra V. N and S. N. Rajaguru

1986 : Environnement et culture De l'Htomme Prehistorique dans be Desert du Thar Rajasthan India, in Aenthropologie Vol. 90 (3) : 407-437

37. Misra V. N. S. N. Rajaguru and H. Raghavan

1988 : Late Pleistocene Environment and Acheulian Culture around Didwana, Rajasthan. in Proceding of the Indian National science Academy. Vol. 54A (3) : 425-438

38. Murty M. L. K

1985 : Ethno-archaeology of the Kurnool caveo Area in World Archaeology Vol. 17 (2) : 182-205

39. Murty M. L. K. and K. T. Reddy

1976 : The Significance of Lithic Finds in cave areas of Kurnool, in Asian Perspectives, Vol. 18 (2) : 214-126

40. Paddayya K.

1982 : The Acheulion culture of the Hunsgi Valey (Peninsular India) : A settlement Perspective. Deccna College, Poona

41. 1984 : India, In New Forchunqen Zur Altsteinzeit: edited by O. Bar-Yosef et. al. PP. 345-403. C. H. Book Venlag Munich.

42. 1985 : Acheulian Occupation Sites and Associated Fossil Fauna from the Hunsgi-Baichbal Valleys, Peninsular India. In Anthropos. Vol. 80.653-658

43. 1987a : The stone Age Cultural systems of the Baichbal Valley, Gulbarga Dist. Karnataka : Preliminary Report. In Bulletin of the Deccan College Research Institute. Vol. 46 : 77-100.

45. 1987b : Excavation of an Acheulian Occupation Site Yediyapur, Peninsular India. In Anthropos Vol. 83 : 610-614

46. 1987c : The Place of the Study of Site Formation Processes in Prehistoric Research in India. In Natural Formation Processes and the Archaeological Record edited by D. T. Nash and M. D. Petraglia, Bar International Serics 352. Oxford, England.

47. 1991 : The Acheulian Culture of the Hunsgi Baichbal Valleys, Peninsular India : A Processual Study. In Quartar, Band 41/42 : 111-138.

48. Paddayya K. and M. D. Petraglia

1990 : Formation Processes of the Acheulian Sites of the Husgi-Baichbal Valleys, Peninsular India, Paper presented at International seminar on "Environmental change on Human Response : Last two Million Years." Deccan College, Pune.

49. Petraglia M. D

1987 : Site Formation Processes at Abri Dufaure : An Upper Palaeolithic Site in Southwest France. Unpublished Ph. D. Dissertation. University of New Maxico.

50. Raghavan H. Rajaguru S. N and V. N Misra

1989 : Radiometric Dating of a Quaternary Dune Section, Didwana, Rajasthan. In Man and Environment. Vol. 7 : 127-129.

51. Rick J. W

1976 : Downstop Movement and Archaeological Intra-Site Spetial

Analysis. In American Autiquity, Vol. 4 (2) : 133-144

52. Schiffer M. B.

1976 : Behavioral archaeology. Academic Press. NewYork.

53. 1977 : Towards a Unified science of the Cultural Past. In Research Strategies in Historical archaeology edited by S. South. PP. 13-50. Academic Press. NewYork.

54. 1983 : Toward the Identification of Formation Processes. In American Antiquity, Vol. 48 : 675-706

55. 1985 : Is there a Pompei in Archaeology. In Journal of Archaeological Research Vol. 41 : 18-41.

56. 1987 : Formation Proecsses of the Archaeological Record. University of New Mexico Press. Albuquerque.

57. Shick K. D. 1984 : Processes of Palaeolithic Site Formation : An Experimental Study. Unpublished Ph. D. Dissertation, Univ of Califunia. Barkely.

58. Stein J. K.

1982 : Earthworm Activity : A source of Potential Disturbance of archaeological Sediments. In American Antiquity Vol. 48 : 227-289.

59. Toth N. P.

1982 : The Stone Technology of Early Hominids at Koobi Fora. Kenya. An Exprimental Approach. Unpublished Ph. D. Dissertation. University of California. Berkeley.

60. Turnbaugh W. H.

1978 : Floods and archaeology. In American Autiquity. Vol 43 : 593-607

61. Villa P.

1983 : Terra Amata and the Middle Plistocene Archaeological Record of Southern France Univ of California. Press. Berkeley.

প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন জনপদ এবং এখানে প্রাপ্ত পোড়ামাটির শিল্পকর্ম

অসিত বরণ পাল

অরণ্যচারী মানব থেকে শুরু করে সকলের ভেতরই একটি শিল্পী মন কাজ করে। প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষকে নতুন নতুন জিনিস উদ্ভাবন করতে হয়েছে। আর তার ভেতরেই প্রতিফলিত হয়েছে তার সৃষ্টিশীলতা। মানুষ তার জীবনের প্রয়োজনেই শিল্পকর্মে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আর তার প্রতিফলন পড়ে ব্যবহার্য দ্রব্যাদিতে। প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষের শিল্পকর্মের প্রধান মাধ্যম হয় মাটি। এ মাটি দিয়েই তারা তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরী করতে থাকে। যেমন, বিভিন্ন ধরনের বাসন পত্র, শিশুদের বিভিন্ন খেলনা সামগ্রী, সীল, ধর্মীয় কাজে ব্যবহৃত নিদর্শন, বিভিন্ন ধরনের অলংকার, প্রভৃতি। এছাড়াও প্রাচীন সভ্যতার মানুষেরা পোড়া মাটির চমৎকার ভাস্কর্য তৈরীতে দক্ষ ছিল। আগুন আবিস্কারের পর থেকে মানুষ যখন পাকান্ন ভোজন শুরু করে তখন থেকে মাটির হাড়ি পাতিলের ব্যবহার শুরু হয়। তাই বিভিন্ন প্রাচীন স্থানে প্রচুর পরিমাণে হাড়ি পাতিলের টুকরা পাওয়া গিয়েছে। এগুলো মানুষের ব্যবহৃত আদি নিদর্শন। মাটির নিচে প্রাপ্ত কোন প্রাচীন নিদর্শন পর্যবেক্ষণ করে একটি যুগের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা যায়। যেমন প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন ও গ্রীক শিল্পকলা থেকে তৎকালীন সময়ে সে দেশগুলোর জীবনযাত্রা প্রণালী জানা যায়।[১] প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে গৃহস্থালীর কাজে পোড়ামাটির থালা বাসনের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, যেমন পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীনতম সভ্যতার কেন্দ্রগুলোতে বিভিন্ন ধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্যাদি আবিস্কৃত হয়েছে, এগুলোর মধ্যে পোড়ামাটির তৈজষপত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া এখানে প্রাপ্ত পোড়ামাটির টালিতে উৎকীর্ণ লিপি থেকেও আমরা তৎকালীন সময়ের মিশর এবং এ অঞ্চলের সভ্যতার বিভিন্ন

বিষয় সম্পর্কে বহু তথ্য পাই। অন্যদিকে ভারতবর্ষের হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতার কেন্দ্রগুলোতে প্রচুর পোড়ামাটির সীল, খেলনা, বাসন ইত্যাদি আবিস্কৃত হয়েছে। এছাড়াও থালা, বাটি, সরা, গ্লাস পেয়ালা ইত্যাদি শুধু নির্মিতই হতো না, অনেক ক্ষেত্রে রং ও বার্ণিস ব্যবহার করে অতি সুন্দরভাবে তা চিত্রিতও করা হতো। হরপ্পার বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের চিত্রিত অনেক হাড়ি পাতিলের টুকরা আবিস্কৃত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের মাটির খেলনা ও পোড়ামাটির পুতুল আবিস্কৃত হয়েছে। এসব নিদর্শনের শিল্প নৈপুণ্য থেকে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মনে করেন সভ্যতা গড়ে ওঠার পূর্ব থেকেই এখানে এ ধরনের শিল্পের চর্চা হয়েছে। সিন্ধু সভ্যতার যুগেই এর পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। অমিয় কুমার মহাশয়ের মতে অতি দীর্ঘকাল ধরে সঞ্চিত কৃষ্টি ও সংস্কার গুলোই ভারতীয় ভাস্কর্যের ভিত্তি।[২] শিল্প সমালোচক ক্রামরিশ সিন্ধু সভ্যতার ভাস্কর্যগুলো পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, ভারতের মৌর্য ভাস্কর্য এবং সিন্ধু সভ্যতার ভাস্কর্যগুলো একই শ্রেণীর ভাস্কর্য।[৩]

প্রাচীন ভারতের শিল্পকলার এ ঐতিহ্য প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন বিহার, মন্দির অলংকরণে প্রচুর ব্যবহৃত হয়েছিল। এদেশে পাথরের দুস্প্রাপ্যতার কারণে শিল্পীরা কখনোই হাল ছাড়েনি। তারা তাদের শিল্প সৃষ্টির বিকল্প মাধ্যম হিসেবে এ দেশের বিভিন্ন মন্দির গাত্রে অলংকরণের জন্য পোড়ামাটির ফলক ব্যবহার করেছে। এই ফলকের প্রচুর ব্যবহার দেখা যায় প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন স্থানে।[৪]

প্রাচীন বাংলার পোড়ামাটি শিল্পের বিকাশ আলোচনার পূর্বে আমাদের এ এলাকার ভৌগোলিক অবস্থা, বিভিন্ন রাজ্যের আয়তন, তখনকার মানুষের ইতিহাস ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা থাকা দরকার। বর্তমান প্রবন্ধের প্রথমে প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন জনপদ এবং পরবর্তীতে এ জনপদ গুলোতে প্রাপ্ত কিছু পোড়ামাটির ফলক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলা বলতে আমাদের চোখের সামনে বিরাট এক দেশের ছবি ভেসে উঠে, যার শিয়রে উত্তুঙ্গ পাহাড়, দু'পাশে কঠিন শিলাকীর্ণ ভূমি এবং পায়ের নিচে বিস্তীর্ণ সমুদ্র। সে সময়ে বাংলাদেশ নানা জনপদে বিভক্ত ছিল। বর্তমানে এসব জনপদের সঠিক অবস্থান নিরূপণ করা না গেলেও বিভিন্ন উৎস থেকে মোটামুটি একটি ধারণা করা যেতে পারে। এসব জনপদকে কেন্দ্র করেই তখন বিভিন্ন ধরনের পোড়ামাটি শিল্পের বিকাশ ঘটে। প্রাচীন কাল থেকে ঐতিহাসিক কাল পর্যন্ত (আনুমানিক খৃষ্টীয় ষষ্ঠ–সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত) বাঙলাদেশ যে সমস্ত জনপদে বিভক্ত ছিল তন্মধ্যে বঙ্গ, পুন্ড্র, বরেন্দ্র, রাঢ়, গৌড়, তাম্রলিপি, সমতট, হরিকেল ও চন্দ্রদ্বীপ অন্যতম।[৫] মৃৎশিল্পের সাথে জড়িয়ে আছে সভ্যতার বিবর্তনের পরিচয়। যে সভ্যতা ক্রমে গ্রাম থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে নগর জনপদ

কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছিল। বাংলার এ নগর সভ্যতা যে কত প্রাচীনকাল থেকে বিবর্তিত হচ্ছিল, নিশ্চয় করে তা বলবার মতো অনুসন্ধান বা গবেষণা এখনো তেমন অগ্রসর হয়নি। বর্তমান খণ্ডিত বাংলার প্রাচীন জনপদ হিসেবে পরিগণিত বঙ্গ, পুন্ড্র, সুহ্ম খণ্ডের অন্যতম পুন্ড্রভূমির কেন্দ্র পুদনগল বা পুন্ড্রনগরের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় সুপ্রাচীন মৌর্য বা পরবর্তী যুগের বগুড়া জেলার মহাস্থান লিপি থেকে।[৬] নিম্নে এ জনপদগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল।

বঙ্গ ঃ বঙ্গ একটি প্রাচীন জনপদ। দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গ নিয়ে এদেশ প্রাচীন কালে গঠিত ছিল। প্রাচীন কালে এ জনপদের সীমানা ছিল পশ্চিমে ভাগীরথী, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা, উত্তরে পদ্মা এবং দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত[৭] ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ নামে একটি দেশের উল্লেখ সর্ব প্রথম দেখা যায়।[৮] মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয় প্রসংগে বংগের উল্লেখ দেখা যায় এখানে ভীম মুঙ্গের রাজাকে হত্যা করেন এবং আরও অগ্রসর হয়ে কোশী নদীর তীরে অবস্থিত পুন্ড্র রাজকে পরাজিত করেন।[৯] দিল্লীর মেহেরৌলি লৌহ স্তম্ভে উল্লেখ আছে যে রাজা চন্দ্র (চন্দ্রগুপ্ত ২য়) তাঁর দিগ্বিজয়ের সময় বঙ্গ দেশ জয় করেছিলেন।[১০] এছাড়া বিভিন্ন ঐতিহাসিক পুস্তকে বঙ্গের উল্লেখ এবং অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া গেলেও সংস্কৃত কবি কালিদাস তাঁর গ্রন্থ 'রঘুবংশে' বঙ্গের উল্লেখ করেছেন। তাঁর গ্রন্থ থেকে জানা যায় নায়ক রঘু প্রথমে সুহ্মদের পরাজিত করেন এবং পরবর্তী সময়ে বঙ্গবাসীদেরকে এলাকা হতে বিতাড়িত করেন এবং (গঙ্গাস্রোতোহন্তরেষু) অঞ্চলে বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করেন। এছাড়া উপরোক্ত শ্লোক হতে বঙ্গবাসীদেরকে 'নৌসাধনোদ্যত' বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।[১১] 'গঙ্গাস্রোতোহন্তরেষু' শ্লোকের ব্যাখ্যা সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মত পার্থক্য থাকলেও একথা সত্য যে এ শব্দ দ্বারা গঙ্গাস্রোতের অনুকূলবর্তী ভূ-ভাগকে নির্দেশ করা হয়েছে। অতএব আমরা বলতে পারি যে গঙ্গার দুই শাখা নদী ভাগীরথী ও পদ্মার তীরবর্তী ত্রিভূজাকৃতিরভূ-ভাগই এ এলাকার অধিবাসীদের আবাসস্থল বঙ্গ। ধারণা করা যেতে পারে কালিদাসের বর্ণিত রঘু বংশের নায়ক রঘু বঙ্গবাসীদের উৎখাত করে যে বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন তাই বর্তমানে টলেমি প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের বর্ণিত গঙ্গরিডই বা গঙ্গারাষ্ট্র।[১২]

পুন্ড্র ও বরেন্দ্র ঃ প্রাচীন পুন্ড্র জনপদ ছিল মুঙ্গের এবং কোশী নদীর পূর্ব দিকে। বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত ব্রাহ্মী লিপিতে উল্লেখ আছে পুণ্ড্রের রাজধানী ছিল পুন্ড্রনগরে এবং এ নগরটির পাশ দিয়ে করোতোয়া প্রবাহিত হতো।[১৩] মহাকাব্য ও পরবর্তী বৈদিক যুগের বিভিন্ন গ্রন্থ হতে পুন্ড্রদেশের অধিবাসীদের সম্পর্কে জানা যায়।[১৪] গুপ্ত রাজাদের তাম্রশাসন ও চৈনিক পরিব্রাজকদের লেখনী থেকে জানা যায় যে পুন্ড্র ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতকে পুন্ড্রবর্ধনে পরিণত হয়েছে এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের একটি ভূক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে।[১৫] রামচরিত

প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থে বরেন্দ্র গংগা ও করতোয়ানদীর মধ্যে অবস্থিত বলে বর্ণিত আছে।[১৬] পুন্ড্রবর্ধনের কেন্দ্রস্থলে আধুনিক রাজশাহী, বগুড়া, এবং পশ্চিম বংগের দিনাজপুর জেলার অংশ নিয়ে প্রাচীন কালে বরেন্দ্র জনপদ গঠিত ছিল।

রাঢ় ঃ রাঢ় ছিল বঙ্গের মত একটি প্রাচীন জনপদ। যাকে উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ় এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। রাঢ় জনপদ সম্পর্কে আমরা আচারাঙ্গ সূত্র নামক একটি জৈন গ্রন্থ হতে জানতে পারি। এ জনপদের উত্তরে ছিল গংগা-ভাগীরথী নদী। আচারাঙ্গ সূত্র হতে জানা যায় যে, জৈন তীর্থংকর মহাবীর কয়েকজন শিষ্য সহ এ অঞ্চলে ধর্ম প্রচারের জন্য এসেছিলেন। কিন্তু এখানকার লোকজন ছিল নিষ্ঠুর ও রূঢ় প্রকৃতির। তারা মহাবীর ও তাঁর শিষ্যদের পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল।[১৭]

গৌড় ঃ গৌড় নামটি আমাদের নিকট সুপরিচিত হলেও এর সঠিক অবস্থান সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। কৌটিল্যের অর্থ শাস্ত্রে গৌড় নামে একটি দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৮] বাৎসায়নের 'কামসূত্রে' গৌড় নামটি সুপরিচিত ছিল।[১৯] এছাড়া পাণিনি সূত্র থেকেও গৌড়পুরের কথা জানা যায়।[২০] মৌখরী রাজ ঈষান বর্মার ৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দের 'হর শিলালিপি' (Hära Inscription) থেকে জানা যায় যে, তিনি গৌড়বাসীদেরকে সমুদ্র পর্যন্তবিতাড়িতকরেছিলেন।[২১] এ থেকে বোঝা যায় গৌড় রাষ্ট্র সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা প্রাচীন গৌড়ের অবস্থিতি জানতে পারি। বাংলাদেশের কোন্ অংশ প্রাচীন যুগে গৌড় নামে অভিহিত হত, তা নির্ণয় করা না গেলেও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র বিভাগ প্রথমে গৌড় নামে পরিচিত ছিল এবং ধারণা করা যায় যে, ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে এ দেশ সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গৌড়ের অবস্থান নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক থাকলেও বিভিন্ন সূত্র হতে জানা যায় বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার বীরভূমই প্রাচীন গৌড় রাজ্যের আদি কেন্দ্র। এ গৌড় রাজ্যের আধিপত্য কখনো কলিঙ আবার কখনো ভূবনেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[২২] খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে শশাংক যখন গৌড়ের রাজা হন তখন তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসূবর্ণতে। বর্তমানে একথা স্বীকৃত যে প্রাচীন গৌড়ের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলার কানসোনা বা রাঙামাটি অঞ্চল।[২৩] চৈনিক পর্যটক হিউয়েন-সাং তাঁর ভ্রমণ বিবরণীতে রক্ত মৃত্তিকা নামক যে বিহারের কথা উল্লেখ করেছেন তা সম্ভবত গৌড়ের রাজধানী কর্ণসুবর্ণের পার্শ্ববর্তী কোন এলাকায় অবস্থিত ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে বর্তমান মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থেকে ১০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিম রাজবাড়ী ডাংগাই ছিল উল্লিখিত রক্তমৃত্তিকা বিহারের ধ্বংসাবশেষ।[২৪]

তাম্রলিপ্তি ঃ মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয় প্রসংগে সম্ভবত তাম্রলিপ্তি নামের সর্ব প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। দীনেশ চন্দ্র সেনের মতে তাম্রলিপ্তিতে কলিংগবাসী নামে এক

দুধর্ষজাতি বসবাস করত বলে এর অপর নাম হয়েছে দামলিপ্ত। পরবর্তী সময়ে এ তাম্রলিপ্তিবাসীগণ দক্ষিণ ভারতে উপবিনেশ স্থাপন করে তামিল নামে অভিহিত হয়েছে। এরা ছিল সুনিপুণ যোদ্ধা। তিনি আরও মনে করেন মহামতি অশোকের সৈন্যগণ অসংখ্য লোক হত্যা করে যে কলিংগ রাজ্য জয় করেছিলো সেই কলিংগ রাজ্যের সৈন্যগণ ছিল তাম্রলিপ্তিবাসী।[২৫] এছাড়া বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থ যেমন মহাভারত, পুরাণ, জৈন কল্পসূত্র, প্রজ্ঞাপনা গ্রন্থ, দশকুমার চরিত এবং বিভিন্ন পর্যটক যেমন টলেমি, ইৎসিং, হিউয়েন সাং, বরাহমিহির প্রমুখের বিবরণীতে তাম্রলিপ্ত, তাম্রলিপ্তি, তমালিনি, দামলিপ্ত, তন্তবুত্তি, তাম্রলিপ্তিক, স্তম্ভপুর, বেলাকুল, টালকটেম্ব প্রভৃতি নামের উল্লেখ আছে। এ সব বিবরণী হতে জানা যায় যে, সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত এ অঞ্চলের সামুদ্রিক ব্যবসার খ্যাতি অক্ষুন্ন ছিল।[২৬] ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে তাম্রলিপ্তি বঙ্গের কেন্দ্রস্থল, উত্তর ও পূর্বাংশ এবং সমগ্র সুহ্ম নিয়ে গঠিত ছিল। প্রাচীন তাম্রলিপ্তি বন্দর ছিল আধুনিক মেদেনীপুর অঞ্চল জুড়ে এবং তমলুক ছিল এ জনপদের রাজধানী। তিনি চীনা পরিব্রাজক হিউয়ের সাং-এর ভ্রমণ বিবরণীর উপর ভিত্তি করে আরও লিখেছেন যে, তাম্রলিপ্তি চিরকুট হতে ১৪০০ লি (আনুমানিক ২৩৩ মাইল) এবং সমতট হতে ৯০০ লি (আনুমানিক ১৫০ মাইল) দূরে অবস্থিত ছিল। যদিও এর ভূমি ছিল সমতল, জলীয় ও স্যাঁত স্যাঁতে, তথাপি স্থল ও জল পথে অন্যান্য রাজ্যের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল ছিল।[২৭]

সমতট ঃ পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এর ভ্রমণ বিবরণীতে সর্ব প্রথম সমতটের উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকে উৎকীর্ণ গুপ্ত রাজা সমুদ্র গুপ্তের (অনুঃ ৩৫৫–৭৬ খ্রীঃ) এলাহাবাদ স্তম্ভ লিপি হতে সমতট সম্পর্কে জানা যায়। কিন্তু লিপিতে এ রাজ্যের সঠিক কোন অবস্থানের উল্লেখ নেই। তবে এই স্তম্ভ লিপি থেকে জানা যায় যে, সমুদ্র গুপ্তের পূর্ব সীমান্তস্থিত করদ রাজ্যগুলোর মধ্যে নেপাল, ডবাক, কর্তৃপুর, কামরূপ এবং সমতট অন্যতম ছিল। বরাহমিহির প্রণীত বৃহৎ সংহিতায় মিথিলা ও ওড্র দেশের নামের সাথে সমতটকে সংযুক্ত করা হয়েছে।[২৮] এছাড়া এ গ্রন্থে সমতটকে বঙ্গ জনপদ থেকে পৃথক ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। রাজা দামোদর দেবের মেহার তাম্রশাসনে সমতট নামের সর্বশেষ উল্লেখ দেখা যায়। বর্তমানে মেহার অঞ্চলটি আধুনিক কুমিল্লা শহর হতে ৩২/৩৩ মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত। এ মেহার তাম্রশাসনে এ অঞ্চলকে সমতট মণ্ডলের অন্তর্গত বলে অভিহিত করা হয়েছে।[২৯] পালরাজ মহীপালদেবের উৎকীর্ণ বাঘাউরা ও নারায়ণপুরে প্রাপ্ত মূর্তি লিপি হতে সমতট সম্পর্কে জানা যায়।[৩১] সম্ভবত খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্য সমতট রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। আধুনিক কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে আবিস্কৃত বিভিন্ন তাম্রশাসন থেকে জানা যায়

দেবপর্বত (ময়নামতি) ছিল সমতটের রাজধানী এবং এটি ক্ষীরোদা নদী (আধুনিক ক্ষীর নদী) দ্বারা বেষ্টিত ছিল। সুতরাং ধারণা করা যেতে পারে যে ত্রিপুরা–নোয়াখালি ও কুমিল্লা জেলা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল নিয়ে সমতট রাজ্য গঠিত ছিল।

হরিকেল ঃ প্রাচীন ভৌগোলিক নাম 'হরিকেল' এর সঠিক সীমানা নির্দিষ্ট করা যায় না। হরিকেল জনপদটি সমতট রাজ্যের পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে হরিকেল জনপদটিকে হরিকেল, হরিকেলা, হরিকোল ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পাওয়া যায়। চৈনিক পর্যটক ইৎসিং এর ভ্রমণ বিবরণীতে হরিকেল নামের উল্লেখ আছে। ইৎসিং সিংহল হতে সমুদ্র পথে উত্তর পূর্বাভিমুখে যাত্রা করে পূর্বভারতের পূর্ব সীমান্তে হরিকেল রাজ্যে উপস্থিত হন।[৩১] হেমচন্দ্র বিরচিত 'অভিধান চিন্তামনি' গ্রন্থে হরিকেল ও বঙ্গ একার্থবোধক বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩২] ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার আবার হরিকেলকে সমতট ও উড়িষ্যার মধ্যবর্তী স্থান বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৩] বিভিন্ন সাহিত্য গ্রন্থ হতে জানা যায় বর্তমান সিলেট অঞ্চলই প্রাচীন বাংলার হরিকেল জনপদ বলে বিবেচিত হতো।[৩৪] আবার পি, এন, পাল মনে করেন বাকেরগঞ্জ ও নোয়াখালি জেলার কিছু অংশ নিয়ে হরিকেল গঠিত ছিল।[৩৫] উপরোক্ত তথ্য থেকে মনে করা যেতে পারে যে হরিকেল রাজ্যের অবস্থান ছিল তাম্রলিপ্তি হতে কয়েক যোজন উত্তরে মেঘনা নদীর পশ্চিমে।[৩৬] সম্প্রতি কুমিল্লা এবং আশেপাশের কয়েকটি অঞ্চলে আবিস্কৃত তাম্রশাসন এবং অন্যান্য প্রত্ন সামগ্রি পরীক্ষা করে পন্ডিতগণ মনে করছেন বর্তমানে সিলেট, ত্রিপুরা রাজ্য, কুমিল্লা, ফেনী ও নোয়াখালীর অংশ বিশেষ নিয়ে হরিকেল রাজ্য গঠিত চিল।

চন্দ্রদ্বীপ ঃ প্রাচীন কালে চন্দ্রদ্বীপ ছিল বঙ্গের অন্তর্গত একটি প্রাচীন জনপদ। চন্দ্র রাজাদের তাম্রশাসন হতে জানা যায় চন্দ্রদ্বীপ ত্রৈকল্য চন্দ্রের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৩৭] চন্দ্রদ্বীপে প্রাপ্ত তারা মূর্তি লিপিতে উল্লেখ আছে যে বাংলাদেশের বাকেরগঞ্জ জেলাই ছিল প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপ।[৩৮]

বাংলাদেশে কোন্ সময়ে সর্ব প্রথম মানুষের বসতি গড়ে উঠে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। ভূতাত্ত্বিক বিচারে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তের পার্বত্যাঞ্চল ও তৎসংলগ্ন ভূ-ভাগ এবং দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। এই প্রাচীন ভূখন্ডে অনুসন্ধান ও প্রত্নতাত্ত্বিক খনন চালিয়ে কিছু প্রাচীন যুগের মানুষের ব্যবহৃত নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। এ সব নিদর্শন পরীক্ষা করে পন্ডিতরা অনুমান করেন যে, প্রত্ন প্রস্তর যুগে এখানে মানুষের বসবাস গড়ে উঠে। সাম্প্রতিক কালে জাহাংগীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব প্রকল্পের ভিজিটিং প্রফেসর ডঃ দিলীপ কুমার চক্রবর্তী বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার লালমাই ও ময়নামতি অঞ্চলে অনুসন্ধান চালিয়ে কিছু

অশ্মীভূত পাথরের হাতিয়ার আবিস্কার করেন এবং এ গুলোর উপর প্রয়োজনীয় গবেষণা করে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন আজ থেকে ২০–২৫ হাজার বৎসর পূর্বে বাংলায় মানুষের বসতি গড়ে উঠেছিল। অন্যদিকে প্রাচীন বাংলার অধিবাসীদের সাথে বৈদিক যুগের আর্য জাতির সম্পর্ক সম্বন্ধে নিশ্চিত জানা যায় না। বৈদিক আর্যরা যখন এ দেশে আসে তখন তাদের প্রভাব এ অঞ্চলের অধিাসীদের উপরে পড়েছিল। আর্যরা বাংলাদেশের অধিবাসীদের দস্যু জাতি বলে অভিহিত করেছে।

উপরোক্ত তথ্যের আলোকে গবেষকদের ধারণা এদেশবাসীর উপর আর্য সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার করতে অনেক দিন লেগেছিল। পশ্চিম বংগের বীরভূম ও বর্ধমান জেলার অজয়, কুনুর ও কোপাই নদীর তীরে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এক প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। এ সব এলাকায় প্রাপ্ত নিদর্শন গুলো পর্যবেক্ষণ করে পন্ডিতগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন সিন্ধু সভ্যতা ও মধ্য ভারতের রাজস্থানের অনেক জায়গায় যে তাম্র প্রস্তর যুগের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল, অনুরূপ নিদর্শন এসব এলাকাতেও পাওয়া গিয়েছে।[৩৯] পান্ডু রাজার ঢিবিতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে কয়েকটি চিহ্ন খচিত সীল পাওয়া গিয়েছে। এ সীলগুলোর লিখন পদ্ধতি ছিল চিত্রাক্ষর এবং এগুলো ছিল ভূ-মধ্যসাগরীয় ক্রীট দ্বীপের। সীল ছাড়াও এখানে প্রাপ্ত অন্যান্য প্রত্ন নিদর্শন পরীক্ষা করে পন্ডিতগণ মনে করেন ক্রীট দ্বীপের সাথে বাংলার বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। তাঁরা আরও মনে করেন খ্রীষ্টপূর্ব ১ম ও ২য় শতাব্দীতে এখানে এক উন্নত মানের বস্তুগত সংস্কৃতি (Meterial culture) গড়ে উঠে।[৪০] এ ঢিবিতে প্রাপ্ত নিদর্শন গুলো থেকে বলা যায় এখানকার অধিবাসীরা মাটির সাথে নলখাগড়া মিশিয়ে অত্যন্ত সুন্দর করে বাড়ী-ঘর তৈরী করত, তারা তামার ব্যবহার জানত, কৃষি কাজ করত এবং মাতৃকা দেবীর পুজা করত।[৪১]

পান্ডু রাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত সীলগুলো থেকে পন্ডিতদের ধারণা তখন ভূ-মধ্য সাগরীয় ক্রীট দ্বীপের সাথে এদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। বাংলার যে সমস্ত স্থানে অনুসন্ধান ও প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে পোড়ামাটির ফলক ও মূর্তি আবিস্কৃত হয়েছে সে গুলোর মধ্যে তমলুক, হরিনারায়ণপুর, চন্দ্রকেতুগড়, পোখরনা, ময়নামতি, পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, কর্ণসুবর্ণ, বানগড় এবং সাভার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[৪২] উপরোক্ত অঞ্চল গুলো প্রাচীন বাংলার সমৃদ্ধির পরিচয় বহন করে। এ সমৃদ্ধির মূলে ছিল বাংলার সম্প্রসারিত বৈদেশিক বাণিজ্য। এখানে উৎপন্ন বিভিন্ন দ্রব্যাদি, যেমন শালিধান, যব, কার্পাস, কার্পাস বস্ত্র ইত্যাদি বহির্বিশ্বে রপ্তানি করা হতো।[৪৩]

মৃৎফলক অর্থাৎ টালি, ফলক লিপি, দেবদেবীর মূর্তি, মনুষ্য মূর্তি, খেলনা পুতুল,

হাড়িপাতিল, পশু–প্রাণীর মূর্তি, গাছপালা, লতাপাতা প্রভৃতি ফলক শিল্প মাত্রই পোড়ামাটির ফলক বা টেরাকোটা। পোড়ামাটির ভাস্কর্য নির্মাণের জন্য প্রধানত লাল আঠালো মাটির প্রয়োজন। এ মাটির সংগে পরিমাণ মত বালি মিশিয়ে প্রথমে কাদা মাটি প্রস্তুত করা হয়। পরবর্তী কালে এ প্রস্তুতকৃত কাদা মাটি ছাঁচে ফেলে পোড়ামাটির ফলক তৈরী করা হয় এবং এগুলোকে রোদ্রে শুকিয়ে আগুনে পোড়ানোর জন্য রেখে দেয়া হয়। আমাদের দেশে দু'পদ্ধতিতে টেরাকোটা নির্মাণ করা হয়; হাতে গড়া এবং ছাঁচে গড়া। টেরাকোটা প্রধানত লাল বর্ণের হয়ে থাকে। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে "খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয়-তৃতীয় শতক হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টোত্তর দ্বিতীয়-তৃতীয় শতক পর্যন্ত সমগ্র গংগা-যমুনা উপত্যকা ও মধ্য ভারত জুড়িয়া পোড়ামাটির এক ধরনের শিল্প শৈলী প্রচলিত ছিল। পাটালীপুত্র হইতে আরম্ভ করিয়া মথুরা পর্যন্ত নানা জায়গায় অল্পবিস্তর পরিমাণে এ শিল্প শৈলীর নিদর্শন আবিস্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ যৌবন সমৃদ্ধ নরনারীর মূর্তি, বিশেষ ভাবে নারী মূর্তি, কিছু কিছু শিশু মূর্তিও আছে; কিছু কিছু আছে শুধু শিশু মুন্ড ও নরনারীর মুন্ড। অনেক গুলি মুন্ডের আকৃতি ও মুখাবয়বে, কেশবিন্যাসে ও মস্তকাভরণে সমসাময়িক যাবনিক (গ্রীক ও রোমান) বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট।[৪৪] মহাস্থান, ময়নামতি, ও পাহাড়পুর, পশ্চিম বংগের পোকরনা, মেদিনীপুরের তমলুকে বর্ধমান, হুগলী এবং বীরভূমে জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানে আবিস্কৃত বিভিন্ন পোড়ামাটির ফলকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষণীয়।[৪৫] মৃৎশিল্পের এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্য কেবল বাংলার ঐশ্বর্যকে সমৃদ্ধ করেছে তা নয়, এর ভিতর লুকিয়ে আছে সেকালের মানুষের চিন্তাধারা, জীবন যাত্রার পদ্ধতি, ধর্ম, সামাজিক প্রথা ও সংস্কার। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে মৃৎ শিল্পের ঐতিহ্য বহুলাংশে লুপ্ত হয়ে গেলেও বাংলাদেশে মাটির ব্যবহার ব্যাপক এবং মৃৎশিল্পীরা আজ বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও তাদের শিল্পকর্ম বাঁচিয়ে রেখেছে।[৪৬]

বানগড়, তমলুক, চন্দ্রকেতুগড়ের প্রাচীন ঢিবিতে খননের ফলে অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সাথে পোড়ামাটির ফলকও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে। ভারতের অন্যান্য স্থান যেমন পাটনা, বক্সার, বিহারের বুলান্দিবাগ, মথুরা, কৌশাম্বি এবং উত্তর প্রদেশের অহিচ্ছত্র থেকে পাওয়া নিদর্শন গুলোর সাথে তুলনা করলে দেখা যায় খৃঃ পূঃ ১ম ও ২য় শতাব্দীতে এ অঞ্চলে এক উন্নতমানের শিল্পকর্ম সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাচীন তাম্রলিপ্তিতে প্রাপ্ত কয়েকটি পোড়ামাটির ফলক বাংলার সর্বপ্রাচীন ভাস্কর্যের নিদর্শন। এর মধ্যে একটি ফলকে একটি যক্ষিনী মূর্তি আছে। এর গঠন প্রণালী ও বসন ভুষন শুংগ যুগের অনরূপ। মহাস্থানগড় থেকেও শুংগ যুগের একটি পোড়ামাটির নারী মূর্তি পাওয়া গিয়েছে।[৪৭] তমলুকে প্রাপ্ত কতগুলো পোড়ামাটির ফলক থেকে শুংগ যুগের সমৃদ্ধির কথা জানা যায়।

বাংলার পোড়ামাটির শিল্পে মৌর্য ও শুংগ যুগের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। বানগড়,[৪৮], চন্দ্রকেতুগড়, ইত্যাদি স্থানে খননের ফলে শুংগ যুগের বিভিন্ন ধরনের পোড়ামাটির ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে। এ ফলক গুলো ছিল তখকার সমসাময়িক ভারহুত, সাঁচী, অমরাবতী ও বোধগয়া প্রভৃতি অঞ্চলের কাঠ ও হাতির দাঁত (Ivory) শিল্পরীতির চেয়ে, রীতি ও ডৌলের দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট। বানগড় থেকে আঙ্গুলে তৈরী ছোট মাপের অনেক পুতুল ও অনেক মাটির ফলক পাওয়া গিয়েছে। যদিও এ ফলক গুলো কিছুটা বঙ্কিম ভংগীতে তৈরী ছাঁচে তথাপি এগুলো রূপ ও রীতির দিক থেকে তমলুক ও চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত ফলকে উ ৎকীর্ণ মূর্তিগুলোর অনুরূপ। এ ছাড়া এ স্থানে পোড়ামাটির কতগুলো নারী মূর্তি ফলক পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে একটি ফলকের টুকরা খুবই চমৎকার, যেটিকে শিল্প ও সৌন্দর্যের বিচারে শুংগ যুগের সবচেয়ে প্রাচীন ফলক বলা যায়।[৪৯] যদিও এ ফলকটির সম্পূর্ণ অংশ পাওয়া যায়নি তথাপি এটি যে দেবী শ্রীলক্ষ্মী তা ফলকটি দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়। এ ফলকে শ্রীলক্ষ্মী পদ্মফুলের উপরে দন্ডায়মান। তাঁর হাতে চুড়ি, পরনে কাপড় ও অন্যান্য পাথরের ও পোড়া মাটির ভাস্কর্য শিল্পের মত।

বগুড়া জেলার মহাস্থান গড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দী হতে খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীর কিছু পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গিয়েছে। এ ফলকগুলোর অধিকাংশের বেশভূষা ও অলংকরণ জমকালো, ফলক গুলো অধিকাংশই নারী মূর্তি। এখানে একটি ফলকে একজন পুজারিণীকে নৈবেদ্য হাতে জানু পেতে বসে থাকতে দেখা যায়।[৫০]

''চন্দ্রকেতুগড় প্রাচীন কালে পোড়ামাটির ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় আকারে পরিণত হয়েছে। এখনে পাওয়া ভাস্কর্য সমূহের মধ্যে নানা গড়নে বহু ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ছোট আকারের মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায়। তার মধ্যে তমলুকের নারী মূর্তির মত সালংকারা, গোলদেহ, মুখ মন্ডলে মায়ামন্ডিত অনেক নারী মূর্তি সংগৃহীত হয়েছে–দুভার্গ্যক্রমে যার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ অক্ষত মূর্তি অতি বিরল। এছাড়া এখানে পাওয়া গিয়েছে গোল বা চৌকো আকারের এক ধরনের ফলক, যার একাধিক মূর্তিতে রয়েছে গতি প্রবণ দ্রুতগামী রথ বা চলনমান সওয়ার পিঠে হাতির রূপায়নে কোন প্রচলিত কাহিনীর ইংগীত। এই একই ধরণের কিছু ফলকে আছে কামলীলার দৃশ্য, যেমনটি সে যুগের অন্যান্য কেন্দ্রের মাটির ফলকে বড় একটি দেখা যায় না''।[৫১] এখানে প্রাপ্ত প্রায় সম্পূর্ণ অবস্থায় একটি ফলক উলেখযোগ্য, যাকে 'শ্রী' অথবা 'লক্ষ্মী' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ ফলকে মূর্তিটি পদ্ম ফুলের উপর দন্ডায়মান এবং তার দু'হাত পদ্ম ফূলের বৃন্ত দ্বারা আবৃত। তাঁর কোমর চমৎকার, স্তন সুগঠিত, এবং চন্দ্রাকৃতির মুখমন্ডলের উপরে

সুপরিপাটি করে কেশ বিন্যাস ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।[৫২] বাংলায় পোড়ামাটির ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে কুষান যুগে এক নতুন ধারা লক্ষ্য করা যায়। চন্দ্রকেতুগড় ও তমলুক হতে এ যুগের অনেক পোড়ামাটির পুরুষ মূর্তি খচিত ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে। এ ফলকগুলোর মুখমণ্ডল গ্রাকো-রোমান শিল্পের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। অপর দিকে পাটালীপুত্র থেকে আবিষ্কৃত অসংখ্য ছোট আকারের মাটির মূর্তিতে মৌর্য আমলের ব্যাপক ও জনপ্রিয় রূপ কর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। কাল নির্ণয়ের অন্য কোন প্রমাণের অভাবে ভারতের অন্যান্য স্থানে প্রাপ্ত বহু শিল্পকীর্তির মতই এ সব পুতুলের ক্ষেত্রে এর গড়ন ও ডৌলের উপর নির্ভর করা ছাড়া অন্যকোন প্রমান এখনো স্বীকৃত নয়। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় মত প্রকাশ করেন যে ভারতে মৌর্য যুগের পর গুপ্ত যুগে শিল্পকলার ক্ষেত্রে এক নতুন শিল্প সৃষ্টি হয়েছিল যাকে ধ্রুপদী শিল্পকলা বলা যায়। এ যুগের শিল্পকলার প্রধান কেন্দ্র সারনাথে অবস্থিত মথুরার ভারী শিল্পকর্ম গুপ্ত যুগেই সুক্ষ্ম শিল্প কর্মে রূপান্তরিত হয়।[৫৩] তবে গুপ্তযুগের শিল্পকলা শুধু শিল্পীদের দক্ষতার পরিচয়ই বহন করে না, এতে শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে সুগভীর মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

গৌড়ের প্রাচীন রাজধানী কর্ণসুবর্ণ অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে কতগুলো পোড়ামাটির মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া এখান থেকে আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর একটি পলস্তরা (Stucco) নির্মিত মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। গুপ্তযুগ থেকে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে মন্দির, বিহার, মঠ, ও রাজপ্রাসাদ প্রভৃতির দেয়াল গাত্রে অলংকরণের ক্ষেত্রে পোড়ামটির তৈরী বিভিন্ন চিত্র খচিত ফলকের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। এ ফলকগুলো ছিল আকৃতিতে কিছুটা বড়। বাংলাদেশে পাথর দুষ্প্রাপ্য বলে এদেশে নির্মিত মঠ, মন্দির, বিহার অলংকরণের জন্য প্রচুর সংখ্যক পোড়ামাটির ফলকের প্রয়োজন হয়েছে, আর প্রয়োজন মিটাবার জন্য এখানে এক ধরনের গ্রাম্য শিল্পীর সৃষ্টি হয়েছিল। এ গ্রাম্য শিল্পীরা তাদের মনের মাধুরী মিশিয়ে মন্দির, বিহার, মঠ, রাজপ্রাসাদ ইত্যাদির গাত্রে অলংকরণের জন্য পোড়ামটি দিয়ে শিল্প সৃষ্টি করেছিল। তারা তখনকার জীবনের বিভিন্ন বাস্তব আলেখ্য, তাদের সমাজের প্রতিচ্ছবি এ সব ফলকের মধ্যে চিত্রিত করেছে। বাংলার লোকায়ত সমাজ তথা সামগ্রিক ভাবে বাংগালীর শিল্প সাধনায় পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকগুলো ত ৎকালীন গণসংস্কৃতির মূল্যবান সম্পদ। পাহাড়পুরের মন্দির গাত্রে প্রায় এক হাজারের বেশী পোড়ামাটির ফলক লাগানো আছে। কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে "অনায়াস পটুত্বে সৃষ্ট পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকগুলিতে শিল্পীর ব্যাপক জগৎ চেতনা, প্রসারিত সন্ধানী দৃষ্টি এবং নিবিড় মানবীয় অনুভূতি ও আবেগ প্রবণতার অদ্ভুত সমাবেশ দেখা যায়। এখানে আছে আদিবাসী পত্র বিভূষণ শবর জাতির নর–নারীর নানা ক্রিয়াকলাপ।

নিহত পশু হাতে শবর নারীর দ্রুত গমন, শবর নর নারীর দ্রুত লয়েনৃত্য– এই ধরনের বহু দৃশ্যে এই শবর জীবনের সংগে এক নিকট ও সহজ সান্নিধ্য থেকে অনুমান হয় যে, সমসাময়িক যুগে এই শবর সমাজ সাধারণ গ্রামীণ সমাজের অতি নিকট সান্নিধ্যে জীবন অতিবাহিত করত। এক সময়ে সাধারণ দ্বিজাতিবহির্ভূত জনগোষ্ঠীর অতি নিকট সান্নিধ্যে কিরাত শবরেরা নিজেদের সরল আদিম শক্তিগর্ভ দৃঢ়কোমল অস্তিত্ব নিয়ে বসবাস করত এবং তারা মার্জিত ভাষা ও সংস্কৃতির উপর যে পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করত পাহাড়পুরের ফলকগুলো তার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য বহন করছে। এদের পাশেই আছে চিরাচরিত অসংখ্য লোক কাহিনী, যে কাহিনীতে পশুজগতের নানা ক্রিয়াকলাপই ছিল মুখ্য বিষয়বস্তু। যা থেকে অসংখ্য কাহিনী গৃহীত হয়েছিল অতীতের গল্প গুলিতে, এবং পরবর্তী কালের বৃহৎ কথাকোষে, হিতোপদেশে এবং পঞ্চতন্ত্র কথায় পশুর শরীরকে নানা ভাবে বিন্যস্ত, চিত্রিত এবং লীলায়িত করে পাহাড়পুরের মৃৎফলক রচনাকারীরা এক সুবিশাল কল্পনার জগতকে লোক চক্ষুর সমক্ষে চিত্ত বিনোদনের উপকরণ হিসেবে উপস্থিত করেছিলেন। এইসব ফলকে চিত্রিত সিংহ যদিও কল্পনার জন্তু তা হলেও হাতি, ষাঁড়, শেয়াল, খরগোশ ইত্যাদি গ্রাম–বাংলার বহু জন্তু জানোয়ার পাহাড়পুরের বিশাল চিত্রশালার উপকরণ হিসেবে গৃহীত হয়েছিল।"[৫৫] পাহাড়পুরের বেশীর ভাগ ফলকেই তৎকালীন জীবনের বিভিন্ন দৃশ্য দেখানো হয়েছে, ধর্মীয় তাৎপর্যপূর্ণ ফলকের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। এ ফলক গুলোতে সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ ও জীবন যাত্রার দৈনন্দিন কাহিনী ফুটে উঠেছে। যেমন মেয়েরা নানা ভংগীতে নৃত্য করছে, শিশুকে কোলে নিয়ে মা কুপ হতে জল তুলছে, প্রেমিক প্রেমিকাকে আলীঙ্গন করছে অর্থাৎ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সকল ছবিই এ ফলক গুলোতে লক্ষ্য করা যায়। পাহাড়পুর ছাড়া বাংলাদেশের অন্যান্য স্থান যেমন ময়নামতি, সাভার, পলাশবাড়ী, সরলপুর, মঙ্গলকোট ইত্যাদি জায়গায় বেশ কিছু পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গিয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে কীর্তিমুখ, কিন্নর, বিদ্যাধর, রাজহংস, বিভিন্ন জীবজন্তু, বাঘ, হরিণ এবং বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি। সাভার থেকে বহু ইষ্টক ক্ষোদিত বৌদ্ধ মূর্তির ফলক আবিস্কৃত হয়েছে। সাভারের নিকটবর্তী রাজাসনে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল বলে অনেকে অনুমান করেন।[৫৬] সাভারে প্রাপ্ত একটি ফলকে ৮টি বৌদ্ধ মূর্তি উৎকীর্ণ করা হয়েছে। এ পোড়ামাটির ইষ্টক নির্মিত ফলকটি সম্পূর্ণ অক্ষত নয়। ফলকটি তিন সারিতে ভাগ করা যায়। ফলকটির প্রতিটি ললিতাসনে এবং বামদিকের মূর্তিটি যোগাসনে উপবিষ্ট। এ মূর্তি দু'টির পাশে বিভিন্ন নক্শা খচিত অলংকরণ লক্ষণীয়। দ্বিতীয় সারিতে তিনটি মূর্তি যথাক্রমে ডানদিক হতে বামদিক পর্যন্ত যোগাসনে ও রাজলীলাসনে উপবিষ্ট। এখানেও নানা ধরনের অলংকরণ লক্ষ্য করা যায়। এ ফলকটির শিল্প সৌন্দর্য দেখে মনে হয় এটি সে আমলের একটি অপূর্ব শিল্পকর্ম।[৫৭]

সম্প্রতি গুপ্ত বা গুপ্ত পরবর্তীকালের কিছু পোড়ামাটির ফলক বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরে সংগৃহীত হয়েছে। এ ফলকগুলো উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর বগুড়া জেলার দুটি গ্রাম সরলপুর ও পলাশবাড়ী থেকে পাওয়া গিয়েছে। ফলক গুলো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ফলক গুলোর অধিকাংশ লিপিযুক্ত এবং এগুলোতে ক্ষোদিত দৃশ্যাবলী রামায়ণ থেকে নেয়া হয়েছে। পলাশবাড়ীতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলক গুলোর ক্ষোদিত লিপির অধিকাংশ পাঠোদ্ধার যোগ্য এবং শৈল্পিক দিক থেকে ও এ গুলো খুবই চমৎকার। অন্য দিকে সরলপুর থেকে প্রাপ্ত ফলকগুলো কিছুটা জীর্ণ প্রকৃতির। পলাশবাড়ী ও সরলপুর প্রায় ৫০টি পোড়ামাটির ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এগুলো বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরের সংগ্রহে রয়েছে। এখানে প্রাপ্ত ফলকগুলোর গড় পরিমাপ ১২"×৮½"–২½"। এ ফলক গুলোতে উৎকীর্ণ লিপির সাথে গুপ্তযুগীয় কলাইকুড়ি, সুলতানপুর (৪৪০ খ্রীঃ), বৈগ্রাম (৪৪৮ খ্রীঃ) এবং গুপ্ত পরবর্তী লোকনাথ (৬৬৩ খ্রীঃ) ইত্যাদি তাম্রশাসনে উ ৎকীর্ণ লিপির নমুনার যথেষ্ট মিল রয়েছে। এ থেকে অনেকে মনে করেন, এ ফলকগুলো খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শেষ দিকের। শৈল্পিক দিক থেকে এ গুলোতে ভারতীয় শৈল্পিক ছাপ থাকলেও বাংলার লোকায়ত শিল্পের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। পাহাড়পুর ও ময়নামতি থেকে সংগৃহীত পোড়ামাটির ফলকে বাংলার চিরায়ত সংস্কৃতির যে নমুনা স্থাপিত হয়েছে তার সাথে এ ফলকগুলোর যথেষ্ট মিল রয়েছে।[৫৮]

সার্বিক আলোচনায় একথা বলা যায় যে, এ দেশে পাথরের অভাব থাকার কারণে প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলার স্থাপত্য প্রধানত ইষ্টক রীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এ দেশের বিভিন্ন স্থাপত্যে একদিকে ইটের ব্যবহার লক্ষণীয়, তেমনি লক্ষণীয় স্থাপত্য গুলোয় প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলক সময়ের বিচারে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ধারণ করছে। যেমন গুপ্ত আমল পর্যন্ত এদেশের পোড়ামাটির ভাস্কর্যের মান উত্তরাবর্তে প্রচলিত সব স্থানের শিল্পের মত সমুন্নত ছিল। শিল্পরীতির দিক থেকে এ পোড়ামাটির ভাস্কর্যগুলো ছিল স্থূলকায়, এবং কর্কশ আকৃতির। বাংলায় পোড়ামাটির ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে পাল আমলে একটি স্বতন্ত্র ধারা সূচিত হয়। এ যুগের পোড়ামাটির ফলক গুলো পর্যালোচনা করে একথা বলা যেতে পারে যে, এ সব মৃৎফলকে লোকশিল্প ও লোক সংস্কৃতির চিত্রায়ণ ব্যাপকতা লাভ করে। এ সব মৃৎফলকে সাধারণ মানুষের বিভিন্ন ঘটনাবলী সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এগুলোর বহুল ব্যবহার পাহাড়পুর মহাবিহারে লক্ষ্য করা যায়।

তথ্যনির্দেশ

১. শ্রী সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় *"সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস,"* জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ ৪৩

২. শ্রী অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়' *বাঁকুড়ারমন্দির*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৩৭১ বাং পৃঃ ১১২-১১৩

৩. **Stella Kramrisch** *The Hindu Temple*, Vol. 1. Calcutta University. Calcutta. 1940. p. 86

৪. শ্রী অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১১৩

৫. নীহার রঞ্জন রায় *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব*, প্রথম খণ্ড, প্রথম স্বাক্ষরতা সংস্করণ, ১৯৮০ পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, কলিকাতা, পৃঃ ১৪৮

৬. *Epigraphia Indica, Vol, XXI.* p. 85. Indian Historical Quarterly 1934. pp. 57ff

৭. রমেশ চন্দ্র মজুমদার *বাংলাদেশেরইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭৪, পৃঃ ৬

৮. **A. B. Keith** *Aitaraya Aranyaka* p. 101. 200

৯. নীহার রঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩১

১০. **J. E. Fleet,** (ed), *Corpus Inscriptionum*, Vol. 111. p. 141

১১. বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌধনোখতান্। নিচখান জয় স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতহন্তরেষু সাঃ। রঘুবংশ ৪র্থ অধ্যায়, শ্লোক নং - ৩৬

১২. **S. M. Ali** *The Geography of the Puranas*, New Delhi. 1966. p. 151

১৩. নীহার রঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩৮

১৪. **S. S. Biswas**: *Terracotta Art of Bengal*, Agam Kala Prakashan. Delhi. 1981. p. 2

১৫. **S. S. Biswas** Ibid. p. 5

১৬. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, পৃঃ ৭

১৭. নীহার রঞ্জন রায়, পৃঃ ১৩৯

১৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৫

১৯. *Kamsutra* (Chowkhamba series), pp. 115, 295

২০. *Kielhorns* (ed), Panini sutra, pp. 269, 282

২১. *Epigraphia İndica*, Vol. XIV. p. 117

২২. নীহার রঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৭

২৩. নীহার রঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৭

২৪. **S. R. Das** *'Rajbaridanga'*, 1962, pp. 56, 67

২৫. ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন *বৃহৎ বঙ্গ*, ২য় খন্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৪১ পৃঃ ১৩৪২ ও ১১০০

২৬. নীহার রঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৫

২৭. **R. C. Majumder** (ed). *History of Bengal*, Vol. 1. Dhaka University. Dhaka. p. 22

২৮. *বৃহৎ সংহিতা*- ১৪শ অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা ৬ (১৪/৬-৮)

২৯. *Epigrphia Indica*. Vol. XXVII, PP. 182-191

৩০. *E. I.*, Vol. XXII. p. 335

৩১. *A Record of Buddhist Religion*, **It-Sing**. Translated by J. *Takakura*, 1896, p. 15; *ঢাকার ইতিহাস (২য় খন্ড)*, কলিকাতা, ১৩২২, পৃঃ ১৬

৩২. *অভিধান চিন্তামনি,* শ্লোক সংখ্যা ৯৫৩
৩৩. **R. C. Majumder,** Ibid. pp. 134-135
৩৪. **S. S. Biswas,** Ibid. p. 9
৩৫. **P. N. Paul** *Early History of Bengal,* Vol. 1. pp. III - IV
৩৬. **B. C. Law** *Historical Geography of Ancient India,* Delhi 1984. p. 222
৩৭. *E. I.,* Vol-I. 136
৩৮. **S. S. Biswas,** p. 99
৩৯. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩-১৪
৪০. **P. C. Dasgupta** *The Excavations at Pandu Rajar Dhibi,* Calcutta. 1964. pp. 28-31
৪১. **A. K. Sur** *Preistory and Beginning of Civilization in Bengal,* Cal. p. 7
৪২. **S. S. Biswas** pp. 23-32
৪৩. কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় বাংলার *ভাস্কর্য,* সুবর্ণরেখা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৮৬, পৃ ঃ ১৭
৪৪. নীহার রঞ্জন রায়, পৃঃ ৭৭৮
৪৫. মোহাম্মদ শাহজালাল *বাংলাদেশের মৃৎশিল্প,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৯২ বাং, পৃঃ ৩৪
৪৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১
৪৭. *History of Bengal,* Vol. I, P. 521
৪৮. **K. G. Goswami** *Excavation at Bangarh,* Calcutta 1848. pp. 18 ff
৪৯. Ibid, p. 21
৫০. ডঃ নাজিমুদ্দিন আহমেদ *মহাস্থান ময়নামতি পাহাড়পুর* ঢাকা, ১৯৭৯. পৃঃ ২১
৫১. কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় পৃঃ ১১-১২
৫২. Similar figurines have been discovered from Kausambi and other ancient sites and also identified. Allabhabad. 1950. pp. 34-35
৫৩. নীহার রঞ্জন রায়, পৃঃ
৫৪. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, পৃঃ ২২৮
৫৫. কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, পৃঃ ৮৫
৫৬. শ্রী যতীন্দ্র মোহন রায় *ঢাকার ইতিহাস,* দ্বিতীয় খন্ড, কলিকাতা, ১৩২২ বঙ্গাব্দ পৃঃ ৫০১
৫৭. উক্ত ফলকটি সাভারের প্রত্নস্থান থেকে পাওয়া গিয়েছে এবং বর্তমানে এটি বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত
৫৮. ডঃ আফরোজ আকমামঃ *'সম্প্রতি মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকে রামায়ণ কাহিনী'* স্থাপত্য ও নির্মাণ, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ৯২। ১২/বি, ৪র্থ তলা রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ
সাভার, ঢাকা

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়